জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-৫ (নব পর্যায়)

পেটের রোগ এবং তাদের চিকিৎসা

সংকলন ও সম্পাদনা
অরণি সেন ও স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন’ উদ্যোগ

জনস্বাস্থ্য বুলেটিন - ৫ (নব পর্যায়)

পেটের রোগ এবং তাদের চিকিৎসা

সংকলন ও সম্পাদনা

অরণি সেন ও স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

Janaswasthya Bulletin 5 (Naba Parjay)
On Gastrointestinal diseases and their treatment.
Compiled by Arani Sen & Snigdha Bandopadhyay

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৫

গ্রন্থস্বত্ব : সীমা রায়

প্রকাশনা : অরণি সেন
'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন'
৮এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

পরিবেশনা : 'উবুদশ'
৮এ নবীন পাল লেন। কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন: ৯৪৩৩৮১৯১০৩, ৯৪৩৩০৩৬৫৩৩

প্রচ্ছদ ও বর্ণস্থাপন : রাজু রায়

মুদ্রণ : শরৎ ইম্প্রেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

যোগাযোগ : **ssunnayan@gmail.com**
www.ssu.2011.com

সংগ্রহ : ৮০ টাকা

উৎসর্গ

ডা: ক্ষিতিশ চন্দ্র সাহা
ডা: দিলীপ মহলানবিশ
ডা: দেবেন্দ্রনাথ গুহ মজুমদার
ডা: সুজিত কুমার ভট্টাচার্য
এবং
ডা: অশোকানন্দ কোনার

সূ চি প ত্র

মুখবন্ধ: ডা: জাফরুল্লা চৌধুরি ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র—বরুণ কাঞ্জিলাল ৭

উদরাময় বা ডায়রিয়া—নিতাই প্রামাণিক ৯

খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর সাধারণ রোগ এবং তাদের প্রতিকার—এস. কে. দত্ত ২০

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আই বি এস)—অরিজিৎ সিনহা ২৬

ফ্যাটি লিভার—সুজিত চৌধুরি ২৮

অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ বা প্যানক্রিয়াটাইটিস—অমৃতা ব্যানার্জী ৩২

জন্ডিস ও ভাইরাল হেপাটাইটিস—প্রবীর পাল ৩৯

লিভারের গল্প: সিরোসিস অফ লিভার—কালিদাস বিশ্বাস ৫৩

ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজ (আই বি ডি)—অরিজিৎ সিনহা ৫৭

Few Words on Universal Health Coverage–Barun Kanjilal ৬০

Diarrhoea among Under Five Children in a village in Sundarbans–D.N. Guha Mazumder ৬৩

পরিশিষ্ট: ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র সাহা ৬৮

ডাঃ দিলীপ মহলানবিশ ৬৯

ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ গুহমজুমদার ৭১

ডাঃ সুজিত কুমার ভট্টাচার্য ৭২

ডাঃ অশোকানন্দ কোনার ৭২

মুখবন্ধ

ডাঃ জাফরুল্লা চৌধুরি এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

বরুণ কাঞ্জিলাল

[ডাঃ জাফরুল্লা চৌধুরি এবং তাঁর 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র' বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং সমাজ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কলেরা মহামারী সহ বিভিন্ন সংক্রামক আন্ত্রিক রোগ প্রতিরোধে অসাধারণ নজির রেখেছেন। তাই তাঁর সামগ্রিক কাজকে নিয়ে বিশিষ্ট স্বাস্থ্য অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ বরুণ কাঞ্জিলালের সংক্ষিপ্ত লেখাটি মুখবন্ধে রাখা হল।—সম্পাদকমণ্ডলী]

ডাঃ জাফরুল্লা চৌধুরি (১৯৪১-২০২৩) চিরবিদায় নিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলির জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের ইতিহাসের একটা অধ্যায় শেষ হল। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য জনস্বাস্থ্যকর্মী, যাঁরা তাঁর জীবনের পথ চলার ইতিহাস থেকে জনস্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রামের হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছেন। এই পথ চলা প্রকৃতই চমকপ্রদ—বিদেশে নামকরা প্রতিষ্ঠানে সার্জারি শিক্ষা দিয়ে যা শুরু হয়ে পরিণতি পেল বর্তমান পুঁজিবাদী স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য এক আপসহীন সংগ্রামের মধ্যে।

এই সংগ্রাম যখন শুরু হয়, তখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলছে। তিনি বিদেশে, সার্জারির উচ্চশিক্ষার শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে। ডাক্তারি পড়াশুনা শিকেয় তুলে স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১-এর সেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে দেশে ফিরে এলেন তরুণ জাফরুল্লা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠা করলেন 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র' যার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের দরিদ্রদের কাছে উন্নত এবং আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সুলভে পৌঁছে দেওয়া। স্বেচ্ছামূলক স্বাস্থ্য পরিষেবার এ এক অনন্য নিদর্শন, গ্রামের গরীবদের কাছে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার এক অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা, যার মূলমন্ত্র হল 'গ্রামে চলো, গ্রাম গড়ো'।

তারপর শুরু হল 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে'র উদ্যোগে এবং ডাঃ জাফরুল্লার নেতৃত্বে 'জন' এবং 'স্বাস্থ্য পরিষেবা' কে যুক্ত করার এক সোনালি অধ্যায়। এর চরম সাফল্য দেখা গেল ১৯৮২ সালে যখন ডাঃ জাফরুল্লার নেতৃত্বে এক

কমিটি নতুন ওষুধ নীতি তৈরি করে সরকারের কাছে প্রায় ১৭০০টি অপ্রয়োজনীয় ওষুধের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার সুপারিশ করলেন। এই সুপারিশের মাধ্যমে সরাসরি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলির 'ওষুধ সাম্রাজ্যবাদ'-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হল। তৎকালীন সরকার এই সুপারিশগুলি গ্রহণ করল। সমসাময়িক উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বাস্থ্যনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এটা এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। বাকিটা ইতিহাস।

তাঁর নেতৃত্বে 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র' এখানেই থেমে থাকেনি, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এগিয়ে চলেছে। নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, দুর্যোগ মোকাবিলা, নাগরিক অধিকার, স্বাস্থ্য বিমা, বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে। 'স্বাস্থ্য' এবং 'উন্নয়ন'-এর প্রকৃত মিলন ঘটাবার জন্য তাঁদের এই নিরলস প্রচেষ্টার মূলে আছে ডাঃ জাফরুল্লার জীবন-দর্শন ও অনুপ্রেরণা। জনস্বাস্থ্য তথা উন্নয়ন আন্দোলনের মহাযোদ্ধাদের মধ্যে তিনিই সম্ভবত শেষ চরিত্র।

জাফরুল্লা সাহেব, দীর্ঘজীবী হোন!

[সৌজন্য: 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন', অক্টোবর ২০২৩]

লেখক পরিচিতি

ড: বরুণ কাঞ্জিলাল (১৯৫৫-২০২৫): আদি নিবাস অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালি। বর্দ্ধমানে বেড়ে ওঠা। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধ্যাপনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুউসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেন। তারপর জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লুমবার্গ স্কুল অফ পাবলিক হেলথ' এর আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিভাগে সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট হিসাবে যোগ দেন। দেশে ফিরে জয়পুরের 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ'এ ২৩ বছর ধরে স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করে অবসর নেন। ৫০টিরও বেশি জাতীয় স্তরের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুন্দরবনের উপরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। কল্যাণীর 'ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ' এর আমন্ত্রিত অধ্যাপক ছিলেন।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া

নিতাই প্রামাণিক*

মলে জলীয় অংশ অস্বাভাবিক বেশি হলে এবং পুনঃ পুনঃ পাতলা পায়খানা সচরাচর ২৪ ঘণ্টা সময়ে তিন বারের বেশি হলে এবং মলের পরিমাণ ২০০ গ্রামের বেশি হলে রোগী **উদরাময়** (Diarrhoea) অসুখে ভুগছে বলে রোগ নির্ণয় করা হয়। এই রোগ (ক) জলের মতো পাতলা পায়খানা বিশিষ্ট কয়েক ঘণ্টা হতে অল্প কয়েকদিন মাত্র রোগভোগ বিশিষ্ট তীব্র উদরাময় হয়ে শরীরে **জল ও ইলেকট্রোলাইট (সোডিয়াম, পটাশিয়াম)**-এর ভীষণ অভাব হয়ে জীবন সংকট হতে পারে। যেমন **'ভিবরিও কলেরি'** ও **'ই. কোলাই' ব্যাক্টেরিয়া** ও **'রোটা ভাইরাস'** ঘটিত উদরাময়। (খ) পাতলা মলের সঙ্গে অল্প বা বেশি পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত থাকতে পারে। যাকে আমরা **'রক্ত আমাশয়' (Bacillary Dysentery)** বলি; যেমন **'সিগেল্লা' ব্যাক্টেরিয়া** ঘটিত ভীষণ 'রক্ত আমাশয়'। (গ) বেশ কিছুদিন যাবৎ সচরাচর ২ সপ্তাহ ও তারও বেশি দিন যাবৎ পাতলা পায়খানায় ভোগা, যেমন **HIV ভাইরাস** আক্রান্ত হলে, **AIDS অসুখের উদরাময়**। (ঘ) ভীষণ অপুষ্টি রোগ ভোগে উদরাময় অসুখে আক্রান্ত হলে, যেমন **'ম্যারাসমাস'** ও **'কোয়াসিওরকার'** নামক প্রোটিন ও কার্বহাইড্রেট অভাব-জনিত কারণে ভীষণ অপুষ্টি অসুখের উদরাময়।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ **'তীব্র উদরাময়'** অসুখে (**Acute Diarrhoea**) প্রতি বৎসর আক্রান্ত হন এবং তার মধ্যে ৩০-৪০ লক্ষ রোগী মারা যান। আক্রান্ত ও মৃত রোগীদের অর্ধেকেই হল এক বছর বয়সের কম বয়সের শিশু ও অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা। উন্নয়নশীল দেশে বয়স্ক মানুষেরাও বেশি সংখ্যায় উদরাময় অসুখে ভোগেন। বেশিরভাগ উদরাময় সংক্রমণ রোগীর মল, দূষিত খাবার ও পানীয় জল গ্রহণ করে হয়ে থাকে (Faeco-Oral Route)। এছাড়াও থালা বাসন, গেলাস, বাটি, বেসিনের জলের ট্যাপ ইত্যাদির জীবাণু দূষণে ও সঠিকভাবে শৌচ না করে খাবার ও পানীয় জল গ্রহণ করেই সংক্রমণ জনিত উদরাময় হয়ে থাকে।

খাদ্যদ্রব্য ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণে খুব শীঘ্র **ছয় ঘন্টার কম সময়ের** মধ্যে যে সমস্ত ব্যাক্টেরিয়া দিয়ে ঘটে তারা হল—**ব্যাসিলাস সিরিয়াস,**

স্টেফাইলোক্কাস অরিয়াস, ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম সৃষ্ট টক্সিন দ্বারা **ফুড্ পয়জনিং**।

১২ ঘণ্টা থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অন্ত্রে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণে ভীষণ উদরাময় যে সকল জীবাণু দ্বারা হয় তারা হল—**এন্টেরোটক্সিজেনিক ই. কোলাই, সিগা টক্সিন সৃষ্টিকারী ই. কোলাই, এন্টেরোইনভেসিভ ই. কোলাই, ভিবরিও কলেরি, সিগেল্লা, সালমোনেলা। ভাইরাস সংক্রমণে** উদরাময়ের সুপ্তিকাল (Incubation Period) অল্প। **প্রোটোজোয়া ঘটিত** উদরাময়ে সুপ্তিকাল অনেকটা দীর্ঘ। সুপ্তিকাল অর্থ জীবাণুর প্রবেশ ও রোগের লক্ষণ প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়।

তীব্র উদরাময় সৃষ্টিকারী কিছুকিছু জীবাণুদের প্রধান ভাণ্ডার (Reservoir) হল উদরাময় রোগগ্রস্থ রোগীরা। এইসব রোগীদের থেকে বেশ কিছু কারণে অন্যান্য মানুষেরা আক্রান্ত হন। এইসব জীবাণুগুলি হল—**ভিবরিও কলেরি, সিগেল্লা, এন্টেরোটক্সিজেনিক ই. কোলাই, এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা, জিয়ার্ডিয়া ল্যাম্বলিয়া**।

অন্যান্য আন্ত্রিক জীবাণুদের প্রধান ভাণ্ডার হল বিভিন্ন পশুরা (Animal Reservoir)। এইসব জীবাণুগুলি পশু এবং উদরাময় অসুখে আক্রান্ত রোগীদের থেকে অন্যান্য মানুষে সংক্রমিত হয়। জীবাণুগুলি হল **ক্যাম্পাইলোব্যাকটার জেজুনি, সালমোনেলা, ইয়ারসিনিয়া এন্টেরোকলিটিকা**।

৬ মাস বয়স হতে ২ বছরের বাচ্চাদের উদরাময় অসুখ সবথেকে বেশি হতে দেখা যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত উদরাময় বেশি হয়। ভাইরাস ঘটিত উদরাময় সাধারণত শীতকালে হয়, তবে রোটা ভাইরাস সংক্রমণ সারা বছর ধরেই হয়।

বেশ কিছু জীবাণুর সংক্রমণে উদরাময়ে অসুখ হয়। তারা হল—

ক) **রোটা ভাইরাস**—শিশু ও বাচ্চাদের প্রবল জলের মতো উদরাময় হয়; **এন্টেরোভাইরাস**।

খ) **সিগেল্লা, সালমোনেলা, ভিবরিও কলেরি, ভিবরিও প্যারা হিমোলিটিকাস, এন্টেরোটক্সিজেনিক ই. কোলাই, ক্যাম্পাইলোব্যাকটার জেজুনি, স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস** ঘটিত খাদ্যে উৎপন্ন বিষজনিত বিষক্রিয়ায় ভীষণ উদরাময়, অন্ত্রে উপস্থিত **ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসাইল** ব্যক্টেরিয়ায় আক্রান্ত উদরাময়।

সিগেল্লা সংক্রমণে মৃত্যুর হার সব চেয়ে বেশি। ভারতে সিগেল্লা সংক্রমণে উদরাময়ের সংখ্যা সব থেকে বেশি। ভারত-সহ এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সর্বত্র স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের সুব্যবস্থা এখনও ভালোভাবে করা সম্ভব হয়নি, মলমূত্র বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা হয়নি, বহু মানুষের স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব এবং পুরাতন অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের অভ্যাস এখনও চলছে, এইসব কারণে পানীয় জল ও খাদ্যদ্রব্য নানান জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে সব থেকে বেশি সংখ্যার উদরাময় রোগী আমাদের দেশে দেখা যায়।

গ) **এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা, জিয়ার্ডিয়া ইনটেসটিনালিস** প্রোটোজোয়া ঘটিত উদরাময়। এইড্‌স্ অসুখে এবং শরীরে অন্যান্য কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া অবস্থায় **ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, আইসোসপোরা, সাইক্লোসপোরা** ইত্যাদি প্রোটোজোয়া ঘটিত সংক্রমণে বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ উদরাময় অসুখ হয়ে থাকে।

উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইওরোপ সহ অধিক সঙ্গতিসম্পন্ন দেশের মানুষরাও অসাবধানতা বশত উদরাময় অসুখে আক্রান্ত হতে পারেন। যেমন ক) উদরাময় অধ্যুষিত অঞ্চলে ভ্রমণকারী মানুষদের পানীয় ও খাদ্যে নানা জীবাণু সংক্রমণে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। কিছু কিছু খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করবার সময় জীবাণু সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা থাকে; যথা— সামুদ্রিক মাছ ও মাংস অর্ধসেদ্ধ ও আধপোড়া অবস্থায় খেয়ে নিলে। (খ) শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে যেমন HIV/AIDS অসুখে, ক্যান্সার অসুখে, কেমোথেরাপি ও স্টেরয়েড ওষুধ প্রয়োগে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাওয়া কিছু রোগীদের উদরাময় অসুখে আক্রান্ত হবার অধিক সম্ভাবনা থাকে। (গ) যেসব মানুষ রোগীদের পরিচর্যা করেন তারা হাসপাতালে রোগী ভর্তি থাকার সময় নানা জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে উদরাময়ে আক্রান্ত হতে পারেন। এইভাবে **ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসাইল** ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা সংক্রমণে উদরাময় অসুখ হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন হতে পারে।

নানা জীবাণু দ্বারা অন্ত্রের সংক্রমণে উদরাময় অসুখ হওয়া ছাড়াও শরীরে অন্যান্য অঙ্গের অসুখের সংক্রমণেও উদরাময় হতে পারে, যেমন— **মেনিনজাইটিস, নিউমোনিয়া, সেপসিস্** বা জীবাণু দ্বারা রক্ত দূষণ, **ম্যালেরিয়া, মধ্য ও অন্তঃকর্ণের প্রদাহ, জননতন্ত্রের অসুখ** ইত্যাদিতে উদরাময় প্রকাশ হতে পারে। এছাড়া **কোষ্ঠকাঠিন্য, আলসারেটিভ কোলাইটিস**

ও ক্রনস্ রোগে, অন্ত্রের ক্যান্সারে রোগীকে **শিরার মাধ্যমে খাবার প্রদানে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অধিক ক্ষরণে, ডায়াবেটিক কিটোসিসে, ইউরেমিয়া** বা কিডনি বিকল হলে, **নিউরো এন্ডোক্রিন টিউমার** অসুখে উদরাময় হতে পারে। কোনো কোনো ওষুধ প্রয়োগে ওষুধের ক্ষতিকর প্রকাশে উদরাময় হয়, যেমন—ক্যান্সার চিকিৎসায় **কেমোথেরাপি ওষুধ** প্রয়োগের ফলে, কিছু কিছু **অ্যান্টিবায়োটিক** প্রয়োগে, **ক্ষতিকর উদ্ভিজ্জ বিষ** ভক্ষণে, **ভারী মৌল ঘটিত ওষুধ** প্রয়োগের ফলে।

কিছু কিছু খাদ্য গ্রহণে জীবাণু সংক্রমণ হয়ে উদরাময় হয়, যথা—

ক) কাঁচা সামুদ্রিক খাবার গ্রহণে, **নোরো ভাইরাস, ভিবরিও, হেপাটাইটিস 'এ'** সংক্রমণ হয়। (খ) কাঁচা অর্ধসিদ্ধ ডিম ও পোলট্রির মাংস গ্রহণের মাধ্যমে **সালমোনেলা** ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ হয়। (গ) অর্ধসিদ্ধ মাংস ও পোলট্রি মাংসের মাধ্যমে **সালমোনেলা, ক্যাম্পাইলোব্যাকটার, এন্টেরোহেমোরেজিক ই. কোলাই, ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেনস** সংক্রমণ। (ঘ) দুধ, ফলের রস এবং নরম চিজ ইত্যাদি পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে শোধিত না করলে **সালমোনেলা, ক্যাম্পাইলোব্যাকটার, এন্টেরো হেমোরেজিক ই. কোলাই, ইয়ারসিনিয়া এন্টেরোকোলিটিকা জীবাণু** সংক্রমণ। (ঙ) ঘরে প্রস্তুত খাবার টিনের কৌটায় সংরক্ষণে **ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম** সংক্রমণে উদরাময় এবং মস্তিষ্ক ও নার্ভের প্যারালিসিস অসুখ।

- **কলেরা: ভিবরিও কলেরি ০১ (ক্লাসিকাল এবং এল. টর) এবং ০১৩৯** ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট অসুখ হল কলেরা। বর্তমানে কলেরা সচরাচর এল. টর বায়োটাইপ এবং ০১৩৯ ভিবরিও দ্বারা সৃষ্ট অসুখ।

কোনো লক্ষণ না থাকলেও কলেরা সংক্রমণ হয়। আবার ভীষণ মারাত্মক লক্ষণ সহ এই অসুখ সময়ে চিকিৎসা না করলে রোগী মারা যেতে পারে। কলেরার লক্ষণগুলি হল—নিস্পৃহভাবে প্রচুর পরিমাণে চাল ধোয়া জলের মতো মুহুর্মুহু পাতলা পায়খানা হতে থাকে ও তার সাথে বার বার ঐরূপ বমিও হতে থাকে। তার ফলে রোগীর শরীর মারাত্মকভাবে জলশূন্য (Dehydration) হয়ে পড়ে, পেটের অভ্যন্তরে অন্ত্রের মাংসপেশীর মোচড় (Cramp) হয়, প্রস্রাব ভীষণ কমে যায় এবং সময়ে সময়ে প্রস্রাব সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় (Anuria)। সঠিক সময়ে ORS অথবা শিরার মাধ্যমে ইলেক্ট্রোলাইট ফ্লুইড দিয়ে চিকিৎসা না করলে ৩০%-৪০% রোগী মারা যেতে পারে।

'ভিবরিও প্যারাহিমোলিটিকাস' (NCV/NAG) ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণে কলেরার মতো পায়খানা হয়। **ক্লাসিক্যাল ও এল.টর ভিবরিও** তিন প্রকার সেরোটাইপ হয়—**'ইনাবা'**, **'ওগাওয়া'**, **'হিকোজিমা'**। ভারতে এল. টর ভিবরিও 'ওগাওয়া' গোত্রের তা পরীক্ষায় জানা গেছে।

'ভিবরিও কলেরি' ফুটন্ত জলে কয়েক সেকেন্ডেই মরে যায়; কিন্তু বরফে ও আইসক্রিমে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ বেঁচে থাকে এবং ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডারের সংস্পর্শে সহজেই মরে যায়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে কলেরা জীবাণু প্রচুর সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং কলেরা **বিষ 'এক্সোটক্সিন'** তৈরি করে এবং তা ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লির (Mucosal Lining) পর্দার কোষের অ্যাডিনাইলিল সাইক্লেজ এনজাইম সিস্টেমকে উদ্দীপ্ত করে এবং চাল ধোয়া জলের মতো প্রচুর দাস্ত সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক চেহারার রোগীদের দিনে ১০ থেকে ২০ লিটার পর্যন্ত জলীয় দাস্ত হতে পারে। একমাত্র মানুষের অন্ত্রেই কলেরা জীবাণু বেঁচে থাকে। কলেরা জীবাণু সংক্রমণদুষ্ট ৭৫% মানুষের কলেরা রোগের কোনো লক্ষণ থাকে না। মাত্র ২০% রোগীদের কলেরা অসুখের প্রচুর জলীয় দাস্ত সহ নানা লক্ষণ দেখা যায়। কলেরা জীবাণু বহনকারী রোগীরা দীর্ঘদিন যাবৎ জনজীবনে কলেরা রোগ ছড়ায়। কলেরা রোগীর দাস্ত বা পায়খানা ও বমি হল কলেরা রোগের উৎস। প্রতি মি.লি. দাস্তে 10^7-10^9 সংখ্যায় ভিবরিও থাকে। কলেরা রোগ সৃষ্টিতে স্বাভাবিক মানুষের অনেক বেশি সংখ্যক ভিবরিও যেমন 10^{11} সংখ্যক ভিবরিও দ্বারা সংক্রমণের প্রয়োজন হয়। একজন কলেরা রোগী হতে অন্যান্য মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে। শিশু ও কিশোর কিশোরীরাই বেশি কলেরা অসুখে আক্রান্ত হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কলেরা রোগীর বমি-পায়খানায় থাকা জীবাণু দ্বারা জল ও খাবার দূষণই কলেরা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। যত্রতত্র পায়খানা ও বমি করার কু-অভ্যাস, অতি নিম্নমানের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি যাপন, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতার ও শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য এবং মাছির উপস্থিতি জনজীবনে কলেরা রোগ ছড়াতে সহায়তা করে।

শরীরে জীবাণু প্রবেশ করার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বা ১ থেকে ২ দিন সময় লাগে কলেরা রোগের উপসর্গ হতে। কলেরা টক্সিনের (এক্সোটক্সিন) দুটি অংশ L এবং H। H টক্সিন ক্ষুদ্রান্ত্রের ঝিল্লি পর্দার কোষের অ্যাডিনাইলিল সাইক্লেজকে উদ্দীপ্ত করে। লক্ষণযুক্ত কলেরা রোগের তিনটি পর্যায়—(১) প্রথম পর্যায়ে বারে বারে প্রথমে বমি ও পরে প্রচুর পরিমাণে চালধোয়া জলের

মতো স্বতঃস্ফূর্ত যন্ত্রণাহীন পায়খানা হয়। (২) রোগের দ্বিতীয় পর্যায়ে শরীর থেকে প্রচুর জলীয় পদার্থ ও ইলেকট্রোলাইট বের হয়ে যাওয়ার জন্য রক্তচাপ প্রচণ্ড কমে গিয়ে ও প্রস্রাব বন্ধ হয়ে রোগীর শরীর ঠান্ডা হয়ে হাত ও পায়ের চামড়া কুঁচকে গিয়ে রোগী আচ্ছন্ন হয়ে যায় বা অজ্ঞান হয়ে যায়। হাতে, পায়ে ও পেটের মাংসপেশীতে টান বা খিঁচ ধরে। (৩) রোগের তৃতীয় পর্যায়ে উপসর্গ ও দ্রুত লক্ষণগুলি বেড়ে গিয়ে মৃত্যু ঘটে যেতে পারে। মুখে বারে বারে ORS (**Oral Rehydration Solution**) শরবত খাইয়ে বা শিরায় স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসায় ধীরে ধীরে রোগী অসুখ হতে সেরে ওঠে।

কলেরা রোগ নির্ণয় করার জন্য কলেরা রোগীর দাস্ত বা বমি থেকে অথবা মলাশয়ের ভিতর থেকে রবারের টিউব বা স্টেরিলাইজ তুলোর সোয়াবের মাধ্যমে রোগীর মল সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় অ্যালকালাইন পেপটোন ওয়াটার বা Cary Blair Medium-এ Mc. Carney Bottle-এ। Bile Salt Agar Media-তেও কলেরা জীবাণু কালচার করে রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করা যায়। মাইক্রোস্কোপে Dark Field Illumination-এর মাধ্যমে ভিবরিও কলেরি জীবাণুদের দলে দলে নাড়াচাড়া করতে দেখা যায় এবং মনে হয় রাতের কালো আকাশে প্রচুর ঝকঝকে তারার গুচ্ছ রয়েছে। কাচের স্লাইডে এক ফোঁটা মলের সঙ্গে এক ফোঁটা Polyvalent Anticholera সিরাম দিয়ে মাইক্রোস্কোপে দেখলে কলেরা জীবাণুর নাড়াচাড়া বন্ধ হতে দেখা যায় এবং এই পরীক্ষায় কলেরা রোগ নির্ণয় নিশ্চিত হয়।

কলেরা রোগীর চিকিৎসা—৯০% কলেরা রোগীদের বারে বারে ORS শরবত খাইয়ে সুস্থ করে তোলা যায় এবং এইভাবে প্রচুর রোগীর জীবন রক্ষা হয়। মাত্র ৫%-১০% রোগীদের শরীরে প্রচণ্ড জলাভাব দেখা দেয় ও বারে বারে বমি করলে রোগীর শিরার মাধ্যমে **Ringer Lactate দ্রবণ, Diarrhoea Treatment Solution (DTS)** বা **0.9% নর্মাল স্যালাইন দ্রবণ** দ্রুত রক্তে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে রোগীর জীবন বাঁচানো হয়। বর্তমানে মুখে খাওয়ানো **ORS** পাউডারের ফর্মুলায় (**Reduced Osmolarity ORS**)—**সোডিয়াম ক্লোরাইড গুঁড়ো 2.6gm, গ্লুকোজ পাউডার 13.5gm, পটাশিয়াম ক্লোরাইড 1.5gm, ট্রাইসোডিয়াম নাইট্রেট ডাইহাইড্রেট 2.9gm (Total-20.5gm)** ব্যবহার করা হয়। এই পরিমাণ গ্লুকোজ এবং মিশ্রলবণের গুঁড়ো একবারে ১ লিটার পরিমাণ সাধারণ ঠান্ডা পানীয় জলে দ্রবীভূত করে বারে বারে রোগীকে খাওয়ানো হয়। রোগীর শরীরে কতটা জলাভাব হয়েছে

তা রোগীর নানা লক্ষণ দেখে নির্ণয় করা হয়—কলেরায় মৃদু, মাঝামাঝি অথবা প্রচণ্ড জলাভাব হয়। ORS পাউডার প্যাকেট সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, হাসপাতালে বা দোকানে ঐ ফর্মুলায় পাওয়া যায়। হাতের কাছে তা না পেলে ঘরে তৈরি লবণ, চিনির জলীয় দ্রবণ শরবত হিসাবে বারে বারে খাওয়ানো যায়। ঘরে প্রস্তুত শরবতের জন্য ১ চামচ নুন, ৬ চামচ চিনি, ১ লিটার পানীয় জলে মেশানো হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ORS শরবত রোগীকে খাওয়ানো শুরু করা যায় ততই ভালো রোগীকে সুস্থ করে তুলতে। ভাতের ফ্যান, ঘোল, ডাবের জল, পাতলা চা ইত্যাদিতে লবণ খুব কম থাকে। তাই এগুলির সাথে প্রতি লিটার দ্রবণে ৩ গ্রাম পরিমাণ সাধারণ খাদ্যলবণ মিশিয়ে তবে তা পান করতে দেওয়া উচিত।

বাচ্চারা ময়ের বুকের দুধ, নরম ভাত-সবজি বা অন্যান্য খাবার যেমন খায় সবই খাবে। পাতলা পায়খানা হলে সেগুলি গ্রহণ বন্ধ করা যাবে না। পাতলা পায়খানা অসুখ থেকে সেরে উঠলেও এসব স্বাভাবিক খাদ্যদ্রব্য আগের মতোই খেয়ে যাবে। তাতে রোগী অসুখ থেকে দ্রুত সেরে উঠবে।

কলেরা রোগে ভিবরিও কলেরি ব্যাক্টেরিয়া নাশ করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এর জন্য মুখে **টেট্রাসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন, কোট্রাইমক্সাজল, এরিথ্রোমাইসিন** ওষুধ খাওয়ানো হয় কয়েক দিন (৫-৭ দিন)।

কলেরা রোগ প্রতিরোধ—কলেরা রোগীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার সাথে সাথে এই অসুখের প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধান পালন করা একান্ত জরুরি। তা হল—১) কলেরার জীবাণু দিয়ে জলদূষণ যেন না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা। (২) রোগীর বমি ও পায়খানা ঠিকভাবে পায়খানার (Latrine) মধ্যে নিষ্কাশন করা এবং বমি পায়খানার স্থানে ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা। রোগীর বমি পায়খানায় ভিজে যাওয়া কাপড় চোপড় জীবাণুমুক্ত করার জন্য ফিনাইল ইত্যাদি জীবাণুমুক্তকরণ তরলে ডুবিয়ে রেখে তবে তা মাটিতে পুঁতে দেওয়া যাতে মাছি না বসে। পুকুর বা পানীয় জলের উৎসের কাছে বর্জ্য পদার্থ ফেলা উচিত নয়। (৩) খাদ্য দ্রব্য সমস্ত তারের জাল দেওয়া আলমারির মধ্যে রাখা, যাতে মাছি না বসতে পারে এবং টাটকা তৈরি করা খাবার খাওয়া দরকার। গভীর নলকূপের জল পান করা দরকার বা সংক্রমণের সময় কিছুদিন জল ফুটিয়ে পান করা ভালো। ঠান্ডা পানীয় বর্জনীয়। (৪) কলেরা প্রতিরোধে ভ্যাকসিন আছে। তা হল মুখে

খাওয়ানো ভ্যাকসিন—(ক) **DUK Oral (Wc-rBS)**—মনোভ্যালেন্ট এবং তাপে মৃত কলেরা জীবাণু ব্যবহার করা হয়। (খ) **Sanchol** এবং **m ORC Vax**—ভ্যাকসিন, ২ সপ্তাহান্তর ২টি ডোজে ভ্যাকসিন খাওয়ানো হয়। কলেরা প্রতিরোধ ক্ষমতা এতে কয়েক মাস থাকে।

● কলেরা ছাড়াও (ক) খাদ্যে নানা জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট বিষ সংক্রমণে **ফুড পয়জনিং** হয়ে বমি ও পাতলা পায়খানা হয়। (খ) এককোষী **এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা** প্রোটোজোয়া দ্বারা জল দূষণে **অ্যামিবিয়েসিস** হলে পাতলা পায়খানা যুক্ত **রক্ত আমাশয়** ও যকৃতে সংক্রমণ হয়ে **অ্যামিবিক হেপাটাইটিস** হয়ে যকৃতে পুঁজ জমে **লিভার অ্যাবসেস** হতে পারে। (গ) **জিয়ার্ডিয়া ইনটেসটিনালিস** প্রোটোজোয়া দূষণে ক্ষুধামান্দ্য, পাতলা পায়খানা, পেট ব্যথা উপসর্গ নিয়ে রোগী অসুস্থ হয়। (ঘ) **সিগেল্লা** ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণে **সিগেল্লাসিস** বা 'প্রবল রক্ত আমাশয়' অসুখে রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে।

● **খাদ্য সংক্রমণ ফুড পয়জনিং**: যে সকল ব্যাক্টেরিয়া দিয়ে ফুড পয়জনিং হয় তা হল—**(১) সালমোনেলা, (২) স্ট্যাফাইলোকক্কাস, (৩) ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম, (৪) ক্লসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেনস, (৫) ব্যাসিলাস সিরিয়াস।**

ফুড পয়জনিং-এর উপসর্গ হলে একই পরিবারে, ছাত্রাবাসে বা একসঙ্গে বসে একই সংক্রমিত খাবার খাওয়ার পর প্রায় সকলেরই খাওয়ার ১ থেকে ৬ ঘণ্টা পর বারে বারে প্রচুর পরিমাণে বমি, পেটব্যথা, জ্বর ও পরে পাতলা পায়খানা শুরু হয়। **স্ট্যাফাইলোকক্কাল ফুড পয়জনিং**-এ শরীরে প্রচণ্ড জলাভাব (Dehydration) হতে পারে। তাড়াতাড়ি শিরার মাধ্যমে স্যালাইন না দিলে বা বারে বারে ORS শরবত না খাওয়ালে রক্তচাপ কমে শক্ হয়ে জীবনহানি হতে পারে। বমনরোধকারী ওষুধ এতে প্রয়োগ করা হয়। সন্দেহজনক খাবার ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে তা কালচার করে স্ট্যাফাইলোকক্কাস আছে কিনা দেখা হয় এবং টক্সিন উৎপন্ন করে কিনা তাও দেখা হয়। দুধ, দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, পনির, রান্না করা মাংস ইত্যাদিতে এই ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ হলে ব্যাক্টেরিয়াজাত টক্সিনে খাদ্যদ্রব্য দূষিত হয়ে এই অসুখের সৃষ্টি হয়।

ব্যাসিলাস সিরিয়াস ফুড পয়জনিং-এ পোলাও, তৈরি করা সবজি ও ফলের রস ইত্যাদি ঠিকমত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ না করলে ব্যাকটেরিয়া স্পোর থেকে এন্টেরোটক্সিন নির্গত হয়। প্রথমে বারে বারে প্রচুর বমি ও পরে পাতলা পায়খানা হয়। রেফ্রিজারেটর ব্যবহারে কমে এসেছে।

ক্লসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেনস ব্যাক্টেরিয়া গবাদি পশুর অন্ত্রে প্রচুর পাওয়া যায়। তাই কসাইখানায় মাংস কাটার সময় ঐ ব্যাক্টেরিয়া মাংসে মিশে যায়। ঐ মাংস সুসিদ্ধ না হলে এবং অর্ধসিদ্ধ মাংস ফ্রিজে সংরক্ষণ করলে ক্লসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেনস স্পোরের সৃষ্টি হয় এবং প্রচুর সংখ্যায় ব্যাক্টেরিয়াও সৃষ্টি হয়। পরে ঐ মাংস আবার আগুনের আঁচে গরম করার সময় পুনরায় স্পোরুলেশন হয়ে এন্টেরোটক্সিন সৃষ্টি করে। মানুষ ঐ মাংস খাবার পর ৬ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে বারে বারে পাতলা পায়খানা ও পেটে মোচড় দিয়ে যন্ত্রণায় ভোগে। স্কুল, কলেজের ক্যান্টিনে খাবার পর বহু ছাত্রের এই উপসর্গযোগে ফুড পয়জনিং হতে পারে। যারা অপুষ্টিতে ভোগে তাদের **'ক্লসট্রিডিয়াম নেক্রোটাইজিং কোলাইটিস'** হয়ে রোগ ভীষণ জটিল হয়ে পড়ে।

সালমোনেলা ব্যাক্টেরিয়া গোত্রের **সালমোনেলা টাইফিমুরাম** ও **এন্টেরাইটিডিস** ব্যাক্টেরিয়ায় জল ও খাদ্য দূষিত হয়ে বিশেষত পোলট্রি মাংস, ডিম দিয়ে প্রস্তুত ফাস্টফুড খাদ্য গ্রহণে পাতলা পায়খানা হয়। এই ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ রোধে সমস্ত মুরগিদের ভ্যাকসিন দেওয়া ও যদি এই অসুখ সংক্রমণে কোনো একস্থানের পোলট্রির খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে সন্দেহ করা হয়, তবে সমস্ত মুরগি মেরে ফেলে মাটিতে পুঁতে দেওয়া উচিত। সালমোনেলা ডায়ারিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'সিপ্রোফ্লক্সাসিন' ওষুধে কোনো কাজ হয় না (রেজিসট্যান্ট)।

ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম ব্যাক্টেরিয়া দূষিত খাদ্যদ্রব্য (সিল করা টিনের পাত্রে সংরক্ষিত খাবার, মধু) গ্রহণে বটুলিনাম টক্সিনের প্রভাবে মস্তিষ্কের ও নার্ভের পক্ষাঘাত হয়ে জীবন বিপন্ন হতে পারে। ঐ রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে দীর্ঘ সময় যাবৎ ৬-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ভেন্টিলেটরে রেখে দেবার প্রয়োজন হতে পারে। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে পাত্রের অভ্যন্তরে অবায়বীয় পরিবেশে বটুলিনাম ব্যাক্টেরিয়া দূষিত খাদ্যদ্রব্য বটুলিনাম টক্সিন সৃষ্টি করতে সহায়তা করে এবং শিশু (মধু খেয়ে) হতে বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সকলেরই ঐ ফুড পয়জনিং হয়ে স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হারিয়ে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

- **অ্যামিবিয়েসিস:** এককোষী পরজীবী **এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা**-র ট্রোফোজয়েট মানুষের বৃহদন্ত্রে প্রচুর ঘা-এর সৃষ্টি করে বারে বারে মিউকাস সহ পাতলা পায়খানা ও তার সাথে রক্ত মিশানো তরল মল সৃষ্টি করে। এতে জ্বর কদাচিৎ হয়। পেটে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। সাধারণত শরীরে জলাভাব বেশি হয় না। কোনো কোনো রোগীর উপরের পেটের ডানদিকে যকৃত বড়

হয়ে **অ্যামিবিক হেপাটাইটিস** হয়। ব্যথা থাকে। এর চিকিৎসা না করলে যকৃতে পুঁজ হয়ে **লিভার অ্যাবসেস** হয়। সাধারণত যারা মদ্যপান করে ও যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের যকৃতে অ্যাবসেস হয়। ট্রোফোজয়েট প্রতিকূল পরিবেশে ক্ষুদ্র **অ্যামিবিক সিস্টে** পরিণত হয় এবং বৃহদন্ত্রে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। মাঝে মাঝে সিস্ট ট্রোফোজয়েটে রূপান্তরিত হয় এবং বারে বারে বৃহদন্ত্রে ঘা করে রক্তমিশ্রিত পাতলা পায়খানা (**অ্যামিবিক কোলাইটিস**) করতে পারে বা ঐ সিস্ট পায়খানার সাথে বাইরে বের হয়ে মাটি ও জল দূষণের মাধ্যমে অন্য মানুষের খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে তাদের অ্যামিবিয়েসিস অসুখের সৃষ্টি করে। এই অসুখের সুপ্তিকাল ২-৪ সপ্তাহ বা তার বেশি।

চিকিৎসাঃ মেট্রনিডাজল অথবা **অরনিডাজল** ট্যাবলেট ইত্যাদি ৭ থেকে ১০ দিন দেওয়া হয় অ্যামিবিক কোলাইটিসে। অ্যামিবিক হেপাটাইটিস ও অ্যাবসেস অসুখে মেট্রনিডাজল-এর সাথে টেট্রাসাইক্লিন বা ডক্সিসাইক্লিন ১০-১৪ দিন দেওয়া হয়।

এই অসুখের প্রতিরোধে জল ও খাবারের দূষণ রোধ করার জন্য সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত। এই অসুখের প্রতিরোধের কোনো ভ্যাকসিন নেই।

- **জিয়ার্ডিয়াসিসঃ জিয়ার্ডিয়া ল্যাম্বলিয়া** প্রোটোজোয়ায় পানীয় জল ও খাদ্য দূষিত হলে এই অসুখে রোগীর পাতলা পায়খানা, বমি, পেটে ব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, বমনেচ্ছা উপসর্গযুক্ত জিয়ার্ডিয়াসিস অসুখ হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম ও জেজুনাম অংশে এই পরজীবী বাসা বাঁধে। ট্রোফোজয়েট ও সিস্ট এই দুই রূপে পরজীবী (Parasites) দেখা যায়। রোগ অবস্থায় প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে এই রোগ হবার প্রবণতা বেশি হয়। মেট্রোনিডাজল ওষুধে এই রোগ নিরাময় হয়। খাদ্য ও পানীয় জলের দূষণ রোধই এই অসুখের প্রতিরোধ করতে পারে। এই রোগের কোনো প্রতিষেধক টিকা নেই।
- **ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি বা রক্ত আমাশয়—সিগেল্লা** নামক গ্রাম নেগেটিভ দণ্ডাকার ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা পানীয় জল ও খাদ্যদ্রব্য দূষিত হয়ে মানুষের বৃহদন্ত্রে সংক্রমণ হয়ে এটি ভীষণ রক্ত আমাশয় রোগের সৃষ্টি করে। চার প্রকার সিগেল্লা ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে **সিগেল্লা ফ্লেক্সনারি** ও **সিগেল্লা ডিসেন্ট্রি** মারাত্মক রক্ত আমাশয়ের কারণ। ক্রান্তীয় অঞ্চলে (Tropical Countries) এই অসুখে আক্রান্ত মানুষের মলদ্বারা জল ও খাদ্য দূষণই এই রোগের উৎস। মাছি এই রোগ ছড়াবার এক প্রধান বাহক। মলত্যাগের পর ভালোভাবে সাবান দিয়ে

হাত না ধুয়ে খাদ্যগ্রহণ করলে এই জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। মানসিক রোগের হাসপাতাল, আবাসিক বিদ্যালয়, কলেজ, যুদ্ধবন্দি শিবির ও সংশোধনাগারে এই অসুখে বহু মানুষ আক্রান্ত হয়।

● **সিগেল্লা সোনেই** সংক্রমণে আমাশয় খুব কম রোগীর ক্ষেত্রেই হতে দেখা যায়। কিন্তু **সিগেল্লা ডিসেন্ট্রি** সংক্রমণে রোগীর জ্বর, পেটে মোচড় দিয়ে ভীষণ ব্যথা, পেটে কুঞ্চন সহ বারবার পাতলা পায়খানা ও শেষের দিকে মলে ভীষণ শ্লেষ্মাসহ রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। সুচিকিৎসা না হলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। রোগীর শরীরে জলাভাব ও ইলেকট্রোলাইটের অভাব ঘটে। বৃহদন্ত্রের উপর চাপ দিলে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। এই জীবাণু সংক্রমণে কোনো কোনো রোগীর বিভিন্ন অস্থিসন্ধির প্রদাহ বা চোখের ভিতর কোরয়েড বা রক্তজাল পর্দার স্তরে প্রদাহ হয়ে দৃষ্টিশক্তি ব্যহত হতে পারে।

এই রোগের চিকিৎসায় বারে বারে ORS শরবত মুখে খাওয়ানো হয়। রোগী ভয়ানক অসুস্থ হলে ও শরীরে প্রবল জলাভাব হলে রোগীর শিরার মাধ্যমে Ringer Lactate, স্যালাইন ট্রান্সফিউশন দেওয়া হয়। রোগীকে Ciprofloxacin অ্যান্টিবায়োটিক ৪-৫ দিন প্রয়োগ করা একান্ত জরুরি। লোপেরামাইড জাতীয় পাতলা পায়খানা রোধকারী ওষুধ ব্যবহার করা কখনোই উচিত নয়।

এই রোগের প্রতিরোধে খাদ্যদ্রব্য, দুধ, জল যেন রোগীর মল দ্বারা দূষিত না হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। রোগীকে আলাদা ঘরে পরিচর্যা করা উচিত। মাছির সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায় সেজন্য ঘরের আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। খাবার আগে বা খেতে দেওয়ার আগে ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া একান্ত দরকার। সচেতন ও সতর্ক থাকলে এবং যথাসাধ্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে ক্রান্তীয় এবং প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক পরিবেশেও রোগমুক্ত থাকা সম্ভব।

---

* ডা: নিতাই প্রামাণিক, ভূতপূর্ব অধ্যাপক, স্কুল ও ট্রপিকাল মেডিসিন, কলকাতা

যকৃতের রোগের লক্ষণ : জন্ডিস, প্যারোটিড গ্রন্থি বৃদ্ধি, হাতের নখ বেঁকে যাওয়া (Clubbing), শরীরে লালচে দাগ (Spider Naevi), হাতের পাতা লাল হওয়া (Palmer erythema), পেট ফোলা, যকৃৎ ও প্লীহার বৃদ্ধি (Hepato splenomegaly), পেটে জল জমা (Ascites), পেটের চামড়ার শিরা ফুলে যাওয়া, ওজন কমা ইত্যাদি।

খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর সাধারণ রোগ এবং তাদের প্রতিকার

এস. কে. দত্ত*

খাদ্যনালীর (Oesophagus) সাধারণ রোগ (Common Diseases):

(১) গলাধঃকরণের সমস্যা (Dysphagia):

খাবার ও পানীয় গিলতে অসুবিধা কিংবা গেলার পর গলা থেকে পাকস্থলী অবধি খাদ্যনালীর কোন জায়গায় লেগে থাকার ভাব (Sensation)। এর মধ্যে গেলার সময় ব্যথা (**Odynophagia**), গলায় চেপে ধরা ভাব (**Globus**), গিলতে না পারা (**Aphagia**) মূলত ফ্যারিনজিয়াল মাসলস্ এর প্যারালিসিসের কারণে এবং/অথবা মুখ শুকিয়ে যাওয়ার (**Dry Mouth or Xerostomia**) উপসর্গ (Symptoms) রূপে দেখা যায়। কোন কোন ওষুধ গ্রহণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় (Adverse or Side Effects) মুখ শুকিয়ে যায়।

গলাধঃকরণের সমস্যাকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—(১) গিলতে (Deglutition) অসুবিধা (**Oropharyngeal Dysphagia**) এবং (২) গেলার পর খাদ্যনালীতে অস্বস্তি বা আটকে যাওয়ার ভাব (**Oesophageal Dysphgia**)। পার্কিনসনিজম, মালটিপল স্কেরোসিস, ব্রেন স্টেম টিউমার, মায়াস্থেনিয়া, মায়োপ্যাথি ও স্নায়ুগুলির বৈকল্যর (Dysfunction) কারণে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। খাদ্যনালীর ক্যানসারের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটে। খাদ্যনালীর সংকোচনের ও খাদ্য প্রবাহের সমস্যা (**Motility Disorder**) এবং পাকস্থলী থেকে খাবার উগরে আসার (**Regurgitation**) কারণেও হতে পারে। কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু শক্ত খাবারের ক্ষেত্রে, কোন ক্ষেত্রে শক্ত ও তরল খাবারের ক্ষেত্রে, অনেকক্ষেত্রে সবসময় নয় মাঝেমাঝে (Intermittent), আবার কিছু ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এই গলাধঃকরণের সমস্যা হয়। খাদ্যনালী ঠিকমত সংকুচিত না হয়ে খাদ্যনালীর নিম্ন স্ফিংটার (Sphincter) ঠিকমত কাজ না করে **Achalasia** রোগের সৃষ্টি করে খাবার ওগরানো, বুকে ব্যথা, বুকজ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

সমস্যাগুলির বাড়তে না দিয়ে হাসপাতালে বা চিকিৎসককে দেখিয়ে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আরোগ্য সম্ভব। সময়মত

চিকিৎসা না করালে রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে দেহের জলশূন্যতা (Dehydration), অপুষ্টি (Matnutrition), ওজন হ্রাস, Aspiration Pnuemonia ইত্যাদি জটিলতার (Complications) সম্মুখীন হতে হয়।

(২) বুক ভার, বুক জ্বালা, অম্বল, চুয়া ঢেকুর ইত্যাদির সমস্যা (Gastro-oesophageal Reflux Disease or GERD):

খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর সংযোগের (Gastro-esophageal Junction) গঠনগত ত্রুটি, স্থানান্তর (Displacement), স্ফিংটার ও পেশির সমস্যা, **হায়াটাস হার্নিয়া,** পেটের মধ্যেকার (Abdominal Cavity) যেখানে পাকস্থলীর একটি অংশ মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) এর ফাঁক দিয়ে বক্ষ গহ্বরে (Thoracic Cavily) উঠে আসে, ইতিবাচক চাপের (Positive Presure) অভাব, অতিরিক্ত ধকল (Strain), অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধি (Obesity) ইত্যাদি কারণে পাকস্থলী থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), পেপসিন, গ্যাসট্রিক লাইপেজ প্রভৃতি এনজাইম; লবণ; হজম না হওয়া খাদ্য (Undigested Food Particles) পাকস্থলী থেকে খাদ্যনালীতে উগরে এসে অনেকক্ষণ থেকে গিয়ে এই উপসর্গগুলি সৃষ্টি করে। খাদ্যনালীর ভিতরের অংশের অ্যাসিড প্রতিরোধী ব্যবস্থা নেই, ফলে ক্ষতর (Ulcer) সৃষ্টি হতে পারে।

শারীরিক পরিশ্রম না করা (Sedentary Life); বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা; তেল, ঝাল, মশলা, ভাজা, চর্বিযুক্ত খাদ্য (Fatty Food) বেশি খাওয়া; মেদবৃদ্ধি; ধূমপান ও মদ্যপান; চা, কফি, চকোলেট ইত্যাদি বেশি খাওয়া; অনিয়ম প্রভৃতির ক্ষেত্রে এগুলি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি (Risk Factors)। অনেক সময় গর্ভবতী মায়েরা (Pregnant Mothers) এই সমস্যায় ভোগেন। নিয়ম মেনে চললে এবং সময়মত হাসপাতালে বা চিকিৎসককে দেখিয়ে চিকিৎসা করলে আরোগ্য লাভ সম্ভব। সাধারণভাবে **Protein Pump Inhibitor** (ওমিপ্রাজল, প্যান্টোপ্রাজল প্রভৃতি), **H_2 Receptor Antagonists** (ফ্যামোটিডিন প্রভৃতি), দিয়ে চিকিৎসা করলে রোগী ভালো হয়ে যায়। কিছু Anti-diarrhoeal (মেটোক্লোপ্রামাইড ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। তাতেও না কমলে **এণ্ডোস্কোপি** প্রভৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগের কারণ নির্ণয় করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। **Oesophageal pH Monitoring, Manometry** প্রমুখ পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে **Fundoplication** ইত্যাদি অস্ত্রপচারের প্রয়োজন হতে পারে।

সময়মত চিকিৎসা না করলে **Erosive Osophagitis, Oesophageal Stricture, Barrett's Oesophagitis, Chronic Cough, Chronic Laryngitis, Asthma, Dental Caries** ইত্যাদি হতে পারে। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে **pH এর পরিবর্তন**। মুখ ও খাদ্যনালীর pH সাধারণভাবে ক্ষারযুক্ত (Alkaline) ৬.৫-৭.৫ এর মধ্যে থাকে যেখানে পাকস্থলীর pH তীব্র অম্লাত্মক (Acidic) ১.০-৩.৫। GERD এ খাদ্যনালী ও মুখের pH 4 এর নিচে নেমে যেতে পারে।

(৩) **Barrett's Oesophagus** : দীর্ঘদিন GERD এর প্রকোপে খাদ্যনালীর এপিথিলিয়াল কোষের পরিবর্তন ঘটে প্রাথমিক ক্যানসারের লক্ষণ দেখা যায়।

(৪) **Eosinophilic Oesophagitis**: অ্যালার্জি জনিত। বসন্তকালে বেশি হয়। সঙ্গে চামড়ায় ঘা (Eczeme) থাকতে পারে।

(৫) **Achlasia**: ইতিমধ্যে আলোচিত।

(৬) **Oesophageal Erosion and Ulcer** :

পাকস্থলীর ওগরানো অ্যাসিড ও এনজাইমের উপস্থিতিতে খাদ্যনালীতে ক্ষয় (Erosion) ও ক্ষতের (Ulcer) সৃষ্টি হতে পারে।

(৭) **Mallary-Weiss Tear** :

খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর সংযোগে গভীর ক্ষত (Laceration)-র ফলে রক্তপাত হয়। প্রবল বমির (Profuse Vomiting) ফলে বক্ষ ও উদরের চাপ বৃদ্ধি পেয়ে উপসর্গের মাত্রা (Intensity) বৃদ্ধি পায়। বমির সঙ্গে টাটকা রক্ত পড়ে (Haematemesis)। Hiatus Hernia থাকলে উপসর্গ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। মলের সঙ্গে কালচে রঙের বাসি রক্ত (Melena) বেরোতে পারে।

(৮) **Oesophageal Infections** : Herpes, Fungus সহ বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ হতে পারে। বিভিন্ন কারণে দেহের রোগ প্রতিরোধ হ্রাস পাওয়া (Immuno Compromised or Immuno-Suppressed) রোগীদের বেশি হয়।

(৯) **Oesophageal Varices** : খাদ্যনালীর নিচের অংশে পোর্টাল হাইপারটেনশন ইত্যাদি কারণে শিরা ফুলে যাওয়া ও তদজনিত রক্তপাত।

(১০) **Oesophageal Carcinoma (CA)** : প্রধানত খাদ্যনালীর উপরিভাগের **Squamous Cell CA** এবং খাদ্যনালীর নিম্নভাগের ও খাদ্যনালী-পাকস্থলী সংযোগে **Adeno CA**-র সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করে চিকিৎসা করলে আরোগ্যলাভ সম্ভব।

পাকস্থলীর (Stomach) সাধারণ রোগ

(১) **Peptic Ulcer Disease বা পেট জ্বলা রোগঃ**
প্রধানত **Helicobacter pylori** ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ এবং যথেচ্ছ ব্যথা উপশমের ওষুধ (**NSAID** ইত্যাদি) ব্যবহারের ফলে পাকস্থলীর এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের (**Small Intestine**) ডিওডেনাম এর গাত্রের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও Proteolytic Enzymes প্রতিরোধী ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে এক বা একাধিক অথবা বহু ক্ষতের (Ulcers) সৃষ্টি হয়। একে **Peptic Ulcer** বলে। পাকস্থলীর ক্ষতকে নির্দিষ্টভাবে **Gastric Ulcer** বলে। খাদ্যনালীর ক্ষতকে **Oesophageal Ulcer** ও ডিওডেনামের ক্ষতকে **Duodenal Ulcer** বলে।

(২) **Gastritis বা পাকস্থলীর প্রদাহ :** উপরোক্ত সংক্রমণ ও ক্ষতিকারক ওষুধের ব্যবহারের ফলে পাকস্থলীর মধ্যে এক ধরনের Autoimmune Reaction, যেখানে দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ত্রুটিবশত দেহের অঙ্গগুলিকে আক্রমণ করে বসে, হয়ে পাকস্থলীর শ্লেষা ঝিল্লি (Mucosa) নষ্ট করে প্রদাহ (Inflammatory Mucosal Injury) সৃষ্টি করে।

(৩) **Gastropathy** : উপরোক্ত **Gastritis** এর কারণে প্রদাহ (Inflammation) ছাড়াও পাকস্থলীর উপর আঘাতের (Injury) সৃষ্টি হয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট **Cirrhosis of Liver** এবং তদজনিত **Portal Hypertension** এর কারণে Gastropathy হতে পারে।

(৪) **Ménétrier's Disease**: এই Gastritis এর ক্ষেত্রে কোষের বৃদ্ধি (Hyperplasia), মিউকোসার বড় ভাঁজ ইত্যাদি দেখা যায়। নিয়ন্ত্রিত না হলে ক্যানসার হতে পারে।

এই রোগগুলিতে পেটের উপরিভাগে তীব্র ব্যথা ও জ্বালা, খালি পেটে বেশি ব্যথা ও জ্বালা, বুক জ্বালা, অম্বল, পেট ভার, চুয়া ঢেকুর, টাটকা রক্ত বমি, মলের সঙ্গে কালচে রক্ত, রক্তাল্পতা, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। উপসর্গ বৃদ্ধি পায় পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রের দেওয়াল ছিদ্র (**Perforation**) হলে। **PPI, H_2 Receptor Antagonist** বা **H_2 Blocker, Antacid, Antidiarrhoel** দিয়ে চিকিৎসা করলে; **Metronidazole, Amoxicillin** প্রভৃতি **Antibiotics** এর **Multi-drug Regime** দিয়ে H. pylori নিয়ন্ত্রণ করে এবং মূলত সিদ্ধ, সুষম, পুষ্টিকর, আহার গ্রহণ করলে ও নিয়ম মেনে চললে রোগী সুস্থ থাকে। দারিদ্র, অশিক্ষা

ও অসচেতনতা, কর্মসংস্থানের অভাব, ঘিঞ্জি বসতি, দূষিত পানীয় জল গ্রহণ, সঠিক শৌচাগার ও বর্জ্য সংস্থাপনের অভাব, কাচা-আধাসিদ্ধ সংক্রমিত খাদ্য গ্রহণ, অতিরিক্ত তেল ঝাল মশলা যুক্ত ও নিম্নমানের খাদ্য গ্রহণ, দীর্ঘসময় খালি পেটে থাকা, ধূমপান, মদ্যপান প্রভৃতি এই রোগগুলির শঙ্কা (Risk Factors) বাড়ায়।

(৫) **Functional Dyspepsia** : পেট ভার (Postprandial Fullness), তাড়াতাড়ি পেট ভরে যাওয়ার অনুভূতি (Early loading feelings), সেইসঙ্গে পেট ব্যথা, জ্বালা ও অস্বস্তি (Discomfort)। বমিভাব (Nausea) থাকতে পারে। অনেক সময় পরীক্ষা করেও কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। H. pylori, GERD, IBS, Dietary Fat, Lactogen Intolerance, Specific Food Allergy, Anxiety, Depression; E. Coli, Giardia বা Salmonella Infection প্রভৃতি কারণেও হতে পারে। নির্দিষ্ট কারণের চিকিৎসা, তার সঙ্গে PPI/H_2 Agonist, Probiotics, Antidepressants প্রভৃতি ব্যবহারে রোগী আরোগ্য পেতে পারে।

(৬) **Gastroparesis** : কোন যান্ত্রিক বাধা (Machanical Obstruction) ছাড়াই পাকস্থলীর খাদ্যবস্তু খালি করার (Gastric Emptying) সমস্যা বা শ্লথতা (Delay)। বমি ভাব, বমি, পেট ফোলা (Abdominal Bloating), অল্প খেলেই পেট ভর্তি ভাব ইত্যাদি উপসর্গ। ডায়াবেটিস, অটোনোমিক স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা, ভেনাস নার্ভের সমস্যা, সংক্রমণ, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া… বিভিন্ন কারণে হতে পারে।

(৭) **Upper Gastro Oeophageal Bleeding**: ফোলা শিরা (**Varices or Varicose Vein**) ফেটে অথবা পেপটিক আলসার, গ্যাসট্রো-ডিওডেনাল ইরোশন, ম্যালরি ওয়েস সিনড্রোম, গঠনগত ত্রুটি, ক্যানসার… বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তীব্র (Acute) অবস্থায় রোগীকে হাসপাতালে রেখে সুস্থিত (Resuscitate) ও সুস্থ করতে হয়। প্রয়োজনে ফ্লুইড, রক্ত দিতে হয়। PPI, H_2 Blocker ইত্যাদি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা ছাড়াও **Sclerotherapy, Banding** প্রভৃতির প্রয়োজন হতে পারে।

প্রসঙ্গত, পেপটিক আলসার অর্থাৎ (১) খাদ্যনালী, (২) পাকস্থলী ও (৩) ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামের আলসার ও ইরোশনের কারণে পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগে (Upper Gastro Intestine) রক্তক্ষরণ (Bleeding or Haemorrhage) হয়। অন্যদিকে সিরোসিস প্রমুখ গুরুতর যকৃত রোগে (Advanced Liver Diseases) ক্ষতিগ্রস্ত কোষের (Scar Tissue) জন্ম

হওয়ায় যকৃতে অক্সিজেনেটেড রক্ত সরবরাহকারী পোর্টাল ও তার সহযোগী শিরাগুলির প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উচ্চ রক্তচাপের (Portal Hypertension) সৃষ্টি হয়। ফলে অন্যান্য শিরার সঙ্গে খাদ্যনালী (৮০%) ও পাকস্থলীর (২০%) শিরাগুলিতেও এই উচ্চ রক্তচাপের ফলে শিরাগুলি ফুলে যায় (Varices) এবং ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। সুতরাং উপরোক্ত দুরকম কারণেই পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগে রক্তক্ষরণ হয়। বমির সঙ্গে টাটকা রক্ত ও মলের সঙ্গে বাসি রক্ত বেরিয়ে আসে।

(৮) **পাকস্থলীর ক্যানসার (Malignancy of Stomach)**: প্রধানত **Adenocarcinoma (৮৫%)**। দূষিত সংক্রমিত খাদ্য, H. pylori সংক্রমণ, পাকস্থলীর অ্যাসিডের মাত্রা কমে যাওয়া, অস্ত্রপচার, দীর্ঘদিন H_2 Blocker (Ranitidine...) খাওয়া ইত্যাদি এর কারণ। প্রাথমিকভাবে নির্ণয় হলে চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য সম্ভব।

খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর এই সাধারণ রোগগুলির চিকিৎসা রয়েছে। প্রয়োজন খাদ্যগ্রহণ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং উপসর্গগুলি দেখা দিলেই হাসপাতালে বা চিকিৎসককে দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

* ডাঃ এস. কে. দত্ত, বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

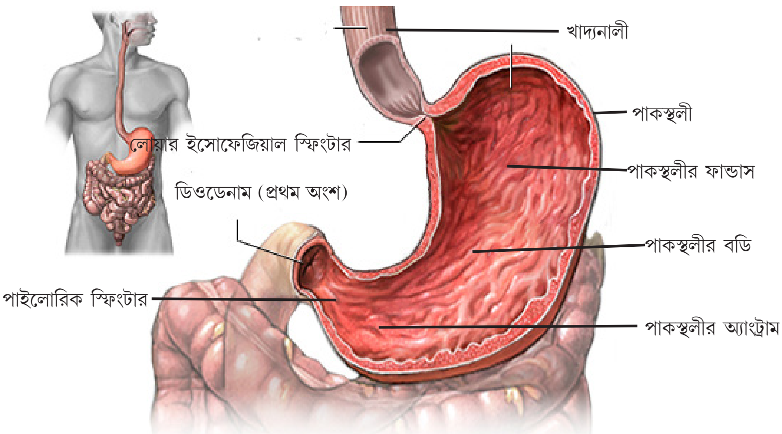

খাদ্যনালী ও পাকস্থলী

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আই বি এস)

অরিজিৎ সিনহা*

ইরিটেবল বাওয়েল সিড্রোম (আই বি এস) এমন একটি অসুখ যেখানে খাদ্যনালীর রোগের লক্ষণ থাকে কিন্তু তার গঠনগত কোন পরিবর্তন থাকে না। এই অসুখের জন্য **'রোম ৪'** নামক একটি নির্ণায়ক লক্ষণ সমুহ আছে। গত তিন মাস ধরে বার বার পেটের যন্ত্রণা অন্তত সপ্তাহে একদিন এবং তার সঙ্গে পায়খানা বসার সম্পর্ক, ঘন ঘন পায়খানা যাওয়া, পায়খানার গঠন গত পরিবর্তন—এই তিনের যেকোনো দুটি থাকলে রোম ৪ অনুযায়ী অসুখটি আই বি এস বলা যায়।

এই অসুখটি যে কোন বয়সে হতে পারে, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর বয়স <৪৫ বছর এবং দুঃশ্চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই রোগীদের মধ্যে বার বার পায়খানা যাওয়ার অভ্যাস থাকে, যা কিন্তু রাতে হয় না বা পায়খানার সাথে রক্ত পড়ে না, ওজন কমে না।

আই বি এস তিন ধরনের—**আই বি এস 'ডি'** (ডায়রিয়া সহ), **আই বি এস 'সি'** (কন্সটিপেশন সহ), **আই বি এস 'এম'** (মিক্সড, উভয় লক্ষণ সহ)। ২৫ থেকে ৫০ ভাগ রোগীর বৃহদন্ত্রের লক্ষণ ছাড়াও ক্ষুদ্রান্ত্রের লক্ষণ থাকে যেমন বমি ভাব, বুক জ্বালা, পেট ফুলে থাকা ভাব।

অসুখ টি কেন হয় জানতে গিয়ে যে সব তত্ত্ব আসে সেগুলি হল—খাদ্য নালীর নড়াচড়া র ব্যাঘাত, পিত্ত অ্যাসিড শোষণে ব্যাঘাত, জেনেটিক ফ্যাক্টর, ব্রেন ও খাদ্যনালীর সমন্বয়ে গোলযোগ, দুঃশ্চিন্তা, অবসাদ। খাদ্যনালীর উপকারী জীবাণুর গঠন ও কার্যকারিতার পরিবর্তন, সেরটোনিন ও প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী কোষের অস্বাভাবিক ব্যবহার। আই বি এস এ যারা ভোগেন তারা পায়খানার বিভিন্ন রকমের বর্ণনা দেন। পায়খানার ধরন বোঝার জন্য আছে **ব্রিস্টল স্টুল স্কেল**।

আই বি এস নির্ধারণের আগে সত্যিকারের গঠনগত কোনো অসুখ যে নেই তা প্রমাণ করতে হয়। সেজন্য কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে যদি কিছু **রেড ফ্ল্যাগ সাইন** বা উদ্বেগজনক চিহ্ন থাকে। রেড ফ্ল্যাগ সাইন গুলির মধ্যে পড়ে—**বয়স ৫০ এর বেশি, পায়খানার সঙ্গে রক্ত, ওজন কমা, জ্বর, রক্তাল্পতা, প্রচন্ড পেটে ব্যথা, রাতের বেলা পায়খানা**

যাওয়া, ৪৮ ঘন্টার বেশি পাতলা পায়খানা, কিংবা পূর্বের আই বি এস এর লক্ষণ গুলি অনেক গুণ বেড়ে যাওয়া।

প্রাথমিক **রক্ত পরীক্ষা**—কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, সি আর পি, ব্লাড গ্লুকোজ, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, থাইরয়েড এর টি এস এইচ, এফ টি ৪, টি টি জি - আই জি এ। **স্টুল এর রুটিন টেস্ট**, ওভা, প্যারাসাইট, অকালট ব্লাড। এছাড়া **হাইড্রোজেন ব্রেথ টেস্ট, গ্লুকোজ হাইড্রোজেন ব্রেথ টেস্ট** করা হয় বিশেষ ক্ষেত্রে। **বেরিয়াম এনেমা, কোলনোসকপি** ও প্রয়োজনে **বায়োপসি** করা হয়ে থাকে। যাদের নিকট আত্মীয়ের কোলন ক্যান্সার এর ইতিহাস আছে তাদের বিশেষ নজরে রাখতে হয়।

আই বি এস এর চিকিৎসার প্রথম ধাপ হচ্ছে **কাউন্সেলিং** (সঠিক পরামর্শ) এবং **সঠিক খাদ্যভ্যাস**। লো 'এফ ও ডি এম এ পি' (**FODMAP**) খাবার উপকারী। বাড়তি ফ্রুকটোজ, কৃত্রিম মিষ্টি জাতীয় সর্বিটল না ব্যবহারই ভালো। রসুন, পেঁয়াজ, ফুলকপি, ক্যাপসিকম, আপেল, পাকা কলা, আঙ্গুর, নারকেল, জুস্, কাজু, সোয়াবিন, দুধ না খাওয়াই ভালো। বাঁধাকফি, বিনস, কলা, আলু, স্কোয়াশ, লেবু, আনারস, মাংস, টাটকা মাছ, ওটস, ভাত, আলমন্ড, মাখন, সর্ষে, পোস্ত ইত্যাদি খাবার কম কষ্ট আনে। **অ্যান্টিস্প্যাস্মডিক** হিসেবে বেলেডনা, ডাইসাইক্লোমিন, **অ্যান্টি ডায়রিয়াল** হিসেবে লোপেরামিড, কোলেস্টিরামিন ব্যবহার হয়। দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখার জন্য অ্যান্টিডিপ্রেসান্ট ড্রাগস্ ব্যবহার হয়। কন্সটিপেশন কাটাতে **ইসবগুল এর ভুষি, পলি ইথিলিন গ্লায়কল, লাকটুলোজ** খেতে দেওয়া হয়। **রিফাক্সিমিন** দু সপ্তাহ, **প্রি বায়োটিক, প্রো বায়োটিক** বেশ উপকারী। **সিকরেটোগোগু**—লুবিপ্রস্টোন, প্লেকানাটাইড এর ব্যবহার অধুনা কালে আশাবাদী।

তীব্রতা অনুযায়ী **আই বি এস—মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার** এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এই রোগের চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে করে থাকেন, তবে **গ্যাসট্রো এন্টারলজিস্ট** এর পরামর্শে বা তত্ত্বাবধানে থাকা ভালো।

---

* ডা: অরিজিৎ সিনহা, বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

বডি মাস ইনডেক্স (BMI)= $\frac{\text{ওজন (কি.গ্রা.)}}{\text{উচ্চতা (সে.মি.)}^2}$

বিএমআই (প্রাপ্তবয়স্ক) এর স্বাভাবিক পরিসীমা: ১৮.৫-২৪.৯ (WHO)

ফ্যাটি লিভার

সুজিত চৌধুরি*

ফ্যাটি লিভার কি?

ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, যা হেপাটিক স্টিটোসিস নামেও পরিচিত, এমন একটি অবস্থা যেখানে লিভারের কোষে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয় (৫ শতাংশ এর থেকে বেশি)। লিভার বা যকৃৎ শরীরের একটি অপরিহার্য অঙ্গ (Vital Organ)। পুষ্টি প্রক্রিয়াকরণ, ক্ষতিকারক পদার্থ বিষমুক্তকরণ এবং রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরির জন্য দায়ী। তবে, যখন লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয়, তখন এটি এই কার্যকারিতাগুলিকে ব্যাহত করতে পারে এবং আরও জটিলতার কারণ হতে পারে।

কিভাবে ফ্যাটি লিভার হয়?

ফ্যাটি লিভার দুটি প্রধান ধরনের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ঃ

অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারঃ এই ধরনের ফ্যাটি লিভার ডিজিজ সরাসরি অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবনের সাথে সম্পর্কিত। লিভার অ্যালকোহল প্রক্রিয়াজাত করে, কিন্তু অতিরিক্ত সেবন লিভারের পদার্থকে বিষমুক্ত করার ক্ষমতাকে অতিক্রম করে। সময়ের সাথে সাথে, এটি লিভার কোষে চর্বি জমা হতে পারে, যার ফলে প্রদাহ এবং অবশেষে লিভারের ক্ষতি হতে পারে।

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার (NAFLD): এটি সাধারণত **স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ কোলেস্টেরলের** মতো অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং মেটাবলিক সিনড্রোমের একটি বৈশিষ্ট্য। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, NAFLD এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী। NAFLD-এর অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে খারাপ খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক কার্যকলাপের অভাব এবং জিনগত প্রবণতা। হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস-এর আক্রমণ। বিভিন্ন ওষুধ যেমন অ্যামিওডারোন, জন্ম নিরোধক বড়ি, ট্যামেক্সিফেন ফ্যাটি লিভার-এর অন্যতম কারণ।

ফ্যাটি লিভারের লক্ষণগুলি কী কী?

ফ্যাটি লিভার রোগ প্রায়শই প্রাথমিক পর্যায়ে লক্ষণ ছাড়াই বিকশিত হয়। রক্ত পরীক্ষা বা আল্ট্রাসাউন্ড বা সিটি স্ক্যানের মতো চিকিৎসা পরীক্ষার সময় এটি সনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত অনেক ব্যক্তি এমনকি বুঝতেও পারেন না যে তাদের এই রোগ আছে। রোগটি বাড়ার সাথে সাথে, কেউ কেউ হালকা লক্ষণ অনুভব করতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে **ক্লান্তি, উপরের ডান পেটে অস্বস্তি** এবং **অব্যক্ত ওজন হ্রাস**। গুরুতর ক্ষেত্রে, **লিভার প্রদাহ** হতে পারে, যা সিরোসিস বা এমনকি **লিভারের FAILURE**-এর দিকে পরিচালিত করে, যা **জন্ডিস, পা ফোলা এবং বিভ্রান্তির** মতো লক্ষণগুলির কারণ হতে পারে।

চর্বিযুক্ত লিভারের জন্য কেন চিন্তা করবেন?

এই ফ্যাটি লিভার রোগে আজকের পৃথিবীর এক বিরাট অংশ আক্রান্ত। সমীক্ষায় দেখা গেছে আমাদের দেশের শতকরা ২৫ শতাংশ লোক এই ফ্যাটি লিভার-এর শিকার। ফ্যাটি লিভার থেকে **ফ্রাইব্রোসিস** এবং **সিরোসিস** হতে পারে। সিরোসিস হল লিভার-এর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত যেখান থেকে লিভার-এর কার্যক্ষমতা বন্ধ হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভার সিরোসিস বা ক্যান্সার এরও কারণ হতে পারে। তবে সবার ফ্যাটি লিভার থেকে ক্যান্সার হবে তা নয়। স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো সাধারণ অন্তর্নিহিত ঝুঁকির কারণগুলির কারণে ফ্যাটি লিভার রোগ হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের মতো কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধির সাথেও যুক্ত।

কিভাবে ফ্যাটি লিভার নির্ণয় করা হয়?

রক্ত পরীক্ষা: এই পরীক্ষাগুলি লিভারের প্রদাহ বা ক্ষতি সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে এবং উচ্চ লিভার এনজাইম মাত্রা চিহ্নিত (যেমন ALT এবং AST) করতে পারে, যা ফ্যাটি লিভার রোগ নির্দেশ করতে পারে।

ইমেজিং পরীক্ষা:

আল্ট্রাসাউন্ড: ফ্যাটি লিভার সনাক্ত করার জন্য এটি সবচেয়ে সাধারণ ইমেজিং পরীক্ষা। এটি শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে লিভারের ছবি তৈরি করে, যা চর্বি জমা প্রকাশ করে। **সিটি স্ক্যান** বা **এমআরআই:** এগুলি লিভারের আরও বিশদ চিত্রের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং চর্বি জমার পরিমাণ নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে।

ফাইব্রোস্ক্যান (ইলাস্টোগ্রাফি): ফাইব্রোস্ক্যান, যা ট্রানজিয়েন্ট ইলাস্টোগ্রাফি নামেও পরিচিত, কম্পন-নিয়ন্ত্রিত ট্রানজিয়েন্ট ইলাস্টোগ্রাফি (VCTE) নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি টিস্যু স্থিতিস্থাপকতার পরিবর্তন সনাক্ত করার জন্য আল্ট্রাসাউন্ড-ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে লিভারের দার্ঢ্য বা কাঠিন্য পরিমাপ করে। লিভারের টিস্যু যত শক্ত হবে, ফাইব্রোসিস বা সিরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। ফলাফলগুলি লিভারের কাঠিন্য পরিমাপ (Liver Stiffness Measurement বা LSM) নামে একটি স্কোর হিসাবে দেওয়া হয়, যা লিভারের ক্ষতির মাত্রা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

ফাইব্রোস্ক্যান কীভাবে কাজ করে?

লিভারের অংশের উপর ত্বকে একটি প্রোব স্থাপন করা হয়। প্রোবটি লিভারে একটি কম্পন তরঙ্গ পাঠায়, যা বিভিন্ন টিস্যুর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গতিতে ভ্রমণ করে। তরঙ্গ কত দ্রুত ভ্রমণ করে তার উপর ভিত্তি করে লিভারের কাঠিন্য পরিমাপ করা হয়। ফলাফল হল লিভারের কাঠিন্যর মূল্যায়ন, যা ফাইব্রোসিস বা সিরোসিসের মাত্রার সাথে সম্পর্কিত। ফাইব্রোস্ক্যান কিলোপাস্কাল (kPa) ফলাফল প্রদান করে। মান যত বেশি হবে, লিভারের কাঠিন্য তত বেশি তীব্র হবে, যা আরও বিস্তৃত ফাইব্রোসিস নির্দেশ করে।

ফাইব্রোস্ক্যানের সুবিধা

অ-আক্রমণাত্মক (Non-invasive): লিভার বায়োপসির বিপরীতে, যেখানে একটি সুই ব্যবহার করা হয় এবং ঝুঁকি বহন করে, ফাইব্রোস্ক্যান সম্পূর্ণরূপে অ-আক্রমণাত্মক এবং নিরাপদ।

দ্রুত এবং ব্যথাহীন: প্রক্রিয়াটি সাধারণত প্রায় ১০ মিনিট স্থায়ী হয় এবং ব্যথাহীন।

সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য: এটি লিভারের শক্ত হয়ে যাওয়ার উপর রিয়েল-টাইম ডেটা সরবরাহ করে, যা লিভারের ক্ষতির মাত্রা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ: লিভারের রোগের অগ্রগতি বা প্রতিরোধ পর্যবেক্ষণের জন্য, বিশেষ করে চিকিৎসাধীন রোগীদের জন্য, সময়ের সাথে সাথে এটি পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

লিভার বায়োপসি: কিছু ক্ষেত্রে, লিভার বায়োপসির প্রয়োজন হতে পারে। লিভার টিস্যুর একটি ছোট নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং একটি মাইক্রোস্কোপের

নিচে পরীক্ষা করা হয় যাতে চর্বির পরিমাণ এবং সম্ভাব্য লিভারের ক্ষতি মূল্যায়ন করা যায়।

আলট্রাসোনগ্রাফি তে ফ্যাটি লিভার ধরা পড়েছে এবার কি করব?

১. চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন

২. চিকিৎসক লিভার রোগের ঝুঁকির কারণগুলি মূল্যায়ন করবেন

৩. প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে

ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসা কি?

১. জীবনযাত্রার পরিবর্তন:

ওজন হ্রাস: শরীরের ওজনের সামান্য অংশ (৫-১০%) কমিয়েও লিভারের স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হতে পারে, লিভারের চর্বি এবং প্রদাহ হ্রাস করতে পারে।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস: মনোযোগ দিন ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য, চর্বিহীন প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বির উপর।

বর্জন করুন চিনিযুক্ত পানীয়, প্রক্রিয়াজাত খাবার, লাল মাংস এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বি।

বিবেচনা করুন: কম চর্বি এবং সরল কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার।

নিয়মিত ব্যায়াম: প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট মাঝারি তীব্রতার কার্যকলাপের লক্ষ্য রাখুন।

অ্যালকোহল সীমিত করুন: অ্যালকোহল গ্রহণ এড়িয়ে চলুন বা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করুন, কারণ এটি লিভারের অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে।

অন্যান্য স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূর বা নিয়ন্ত্রণ করুন: যদি আপনার ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল বা উচ্চ রক্তচাপ থাকে, তাহলে এই অবস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন।

ধূমপান ত্যাগ করুন: যদি আপনি ধূমপান করেন, তাহলে ধূমপান ত্যাগ করা আপনার অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

২. ওষুধ: সাম্প্রতিক সময়ে ফ্যাটি লিভার রোগের চিকিৎসার জন্য কিছু ওষুধ অনুমোদিত হয়েছে।

কিন্তু ওষুধগুলি শুধুমাত্র চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করার পরেই গ্রহণ করা উচিত।

---

* ডা: সুজিত চৌধুরি, বিশিষ্ট গ্যাসট্রো এন্টারলজিস্ট।

অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ বা প্যানক্রিয়াটাইটিস

অমৃতা ব্যানার্জী*

মানুষের দেহে পেটের (Abdomen) মধ্যে পাকস্থলীর (Stomach) পিছনে অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি (Pancreas) (১২ - ১৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও ১০০ গ্রামের মত ওজন বিশিষ্ট) আড়াআড়িভাবে অবস্থান করে। এর মাথার দিকটি চওড়া এবং লেজের দিকটি সরু, অনেকটা ব্যাঙাচির আকৃতি। এটি খাদ্যদ্রব্য হজমে (Digestion) এবং রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে (Blood Sugar Control) সহায়তা করে। কোন কারণে **অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির প্রদাহ (Inflammation)** হলে তাকে প্যানক্রিয়াটাইটিস **(Pancreatitis)** বলে।

অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির তীব্র প্রদাহ হলে তাকে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস **(Acute Pancreatitis)** বলা হয়। এক্ষেত্রে মৃদু (Mild) থেকে প্রবল (Severe) প্রদাহ হয়ে থাকে।

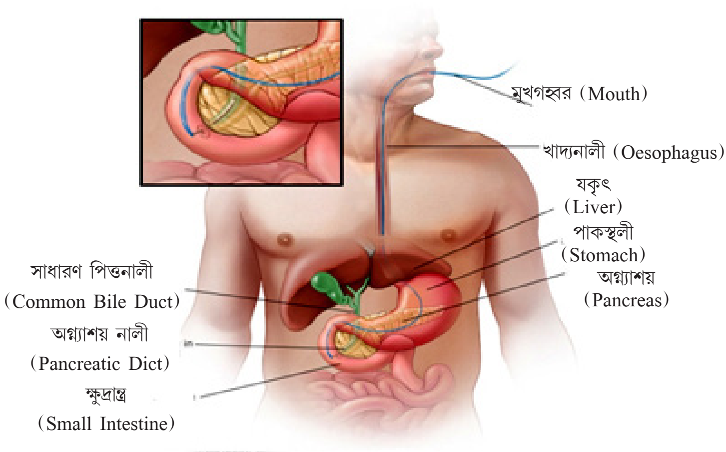

অগ্ন্যাশয়

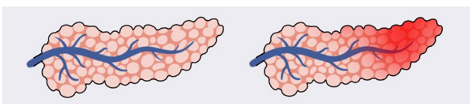

স্বাভাবিক অগ্ন্যাশয় অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস এর উপসর্গ (Symptoms) ও লক্ষণ (Signs):

* পেটের উপরের দিকে প্রবল ব্যথা **(Acute Epigastric Pain)** যা কিনা সামনের থেকে পিছনের দিকে প্রবাহিত হয় (Radiates from Front to Back)। এটি প্রধান উপসর্গ (Main Symptom)। শুয়ে থাকলে, কাশি হলে, ব্যায়াম করলে বা খেলে ব্যথা বাড়তে পারে
* বমিভাব ও বমি। খেলে আরও বেড়ে যেতে পারে। তীব্র অগ্ন্যাশয় প্রদাহের ক্ষেত্রে এই উপসর্গ সাধারণভাবে দেখা যায়
* এছাড়াও জ্বর, নাড়ির গতি বৃদ্ধি, অগভীর শ্বাসপ্রশ্বাস বৃদ্ধি (Increase of Shallow Breathing), দেহের ওজন হ্রাস ইত্যাদি দেখা যায়
* গুরুতর অবস্থায় দেহের ত্বক ও মলমূত্র হলুদ হয়ে যাওয়া (Jaundice) এবং শ্বাসকষ্ট (Breathlessness or Respiratory Distress) দেখা যায়

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস এর কারণ (Aetiology) :

* পিত্তথলিতে (Bile Duct) পাথর জমা (৮০ - ৯০%)। পিত্তনালী (Common Bile Duct) দিয়ে পিত্ত যে ছিদ্রপথে অন্ত্রে (Intestine) উন্মোচিত হয় সেই ছিদ্রপথেই অগ্ন্যাশয়ের নালী (Pancreatic Duct) উন্মোচিত হয়। সেখানে পাথর জমে পিত্তর (Bile) সঙ্গে অগ্ন্যাশয়ের হজমকারক উৎসেচকগুলির (Pancreatic Enzymes) নির্গমনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। অবরুদ্ধ উৎসেচকগুলি অগ্ন্যাশয়ের কোষে প্রদাহ সৃষ্টি করে
* অতিরিক্ত মদ্যপান (১৫ - ৩০%)। রক্তে অ্যালকোহল এর বিষাক্ত উপজাতগুলি (By Products) অগ্ন্যাশয়ের কোষে প্রদাহ সৃষ্টি ও গুরুতর ক্ষতি করে
* রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড এর মাত্রাবৃদ্ধি (১ - ৪%)
* কিছু ওষুধ—Azathioprine, 6—Mercaptopurine জাতীয় Immunomodulators; Tetracycline, Trimethoprim—Sulfamethoxate, Fluroquinolones প্রভৃতি Antibiotics; HIV চিকিৎসার ওষুধ Didanosine (>২৩%); Diuretics; ACE inhibitors; Anticonvulsants (Valproic Acid); Anaesthetics - ব্যবহার করলে (<২%) অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ হতে পারে

* আঘাত এবং / অস্ত্রপচার এর কারণে অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ হতে পারে। বিশেষ করে Pancreatico - duodenectomy এবং পিত্তথলি, পিত্তনালী, যকৃতের অস্ত্রপচারে - Post Operative Pancreatitis হতে পারে
* অগ্ন্যাশয়ে রক্ত সরবরাহের হ্রাস (Ischaemia) এর কারণেও প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে।

অনেকক্ষেত্রে প্যানক্রিয়াটাইটিস এর কারণ জানা যায় না। সেই প্যানক্রিয়াটাইটিসকে ইডিওপ্যাথিক প্যানক্রিয়াটাইটিস **(Idiopathic Pancreatitis)** বলা হয়।

যে সব কারণে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে (Risk Factors) :

* অতিরিক্ত মদ্যপান
* ধূমপান
* মেদবৃদ্ধি বা পৃথুলতা (Obesity)
* ডায়াবেটিস (Diabetes) রোগের উপস্থিতি
* পরিবারে প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগের উপস্থিতি (Family History of Pancreatitis)

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগের জটিলতা (Complications) :

প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগে গুরুতর জটিলতা হতে পারে। যেমন:

* বৃক্ক বা কিডনি বিকল হয়ে যাওয়া (Kidney Failure)
* শ্বাসকষ্ট
* সংক্রমণ
* অগ্ন্যাশয়ের চারপাশে তরল জমা হয়ে থলির (Pseudocyst) সৃষ্টি
* অগ্ন্যাশয়ের পচন (Necrosis)
* শক (Shock)
* অপুষ্টি (Malnutrition)
* ডায়াবেটিস (Diabetes) রোগ
* অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার (Pancreatic Cancer)

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগ নির্ণয় (Diagnosis):

চিকিৎসকরা রোগীর কাছ থেকে রোগটির উপসর্গ, কবে থেকে কিভাবে শুরু হল, রোগীর খাদ্যাভাস, মদ্য পানের অভ্যাস আছে কিনা, কাজের ধরন, পারিবারিক রোগের ইতিহাস ইত্যাদি জেনে; রোগীকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করে; প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা (Complete Blood Count, ESR, C - Reactive Protein, Blood Glucose, Liver Function Tests, Serum Lipase, Serum Amylase, Serum Triglycerides, Electrolytes ...) এবং অন্যান্য পরীক্ষা (Ultrasound / CT scans / MRI) করিয়ে সেগুলির রিপোর্ট দেখে প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগ নির্ণয় করেন।

রক্তে অ্যামাইলেজ (**Serum Amylase**) এবং লাইপেজের (**Serum Lipase**) মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রার চাইতে তিনগুণ বা তার চাইতে বেশি মাত্রায় থাকতে পারে। এই দুটি রক্ত পরীক্ষা প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

নিম্নোক্ত তিনটি সূচকের দুটি থাকলেই প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়েছে বলা যাবে:

(১) পেটের উপরের দিকে নির্দিষ্ট ধরনের যন্ত্রণা (Typical Abdominal Pain in the Epigastrium) যা কিনা সামনের থেকে পিছনের দিকে প্রবাহিত হতে পারে (That may radiate to the back)।

(২) সেরাম অ্যামাইলেজ ও সেরাম লাইপেজের মাত্রা স্বাভাবিকের চাইতে তিনগুণ বা তার বেশি।

(৩) পেটের এক বা বহুমাত্রিক প্রস্থচ্ছেদের ছবিতে (Cross-sectional Abdominal Imaging) অস্বাভাবিকতা দেখে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগ নির্ণয় করা।

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগের চিকিৎসা (Treatment):

দেখা গেছে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ৮৫ - ৯০% ক্ষেত্রে ৩ - ৭ দিনের মধ্যে নিজে থেকে কমে যায় (Self-limited and subsides spontaneously) এবং জটিলতা সৃষ্টি কিংবা অঙ্গ বিকল (Organ Failure) করে না।

* চিকিৎসা হিসাবে - শিরা দিয়ে তরল পুষ্টির ব্যবস্থা করা (Intravenous Fluids); যন্ত্রণা নিবারণ; অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ;

রাইলস টিউব পরিয়ে নরম খাদ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থা; হজম বা পরিপাকে সাহায্যের জন্য উৎসেচকের প্রয়োগ (Enzyme Supplements); অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন নিঃসরণে অক্ষম হলে ইনসুলিন ইঞ্জেকশান প্রয়োগ। প্রয়োজনে অক্সিজেন দেওয়া সহ জীবনদায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। হাসপাতালে ভর্তি করে এই চিকিৎসাগুলি করতে হবে।

তীব্র প্রদাহ নিয়ন্ত্রিত হলে তারপর যে অন্তর্নিহিত কারণগুলির (Underlying Causes) জন্য অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ ঘটেছে সেগুলির প্রতি ব্যবস্থা নেওয়া -

* পিত্তথলিতে বা পিত্তনালীতে পাথর থাকলে মুখ দিয়ে বা খুব ছোট ছিদ্রপথে যন্ত্র ঢুকিয়ে (Endoscopic procedure) পাথর বের করে দেওয়া (যেমন **Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography** অথবা ERCP, যার মাধ্যমে মুখ দিয়ে পিত্তনালী অবধি ক্যামেরাযুক্ত সরু নরম ক্যাথেটার প্রবেশ করানো হয়) অথবা পেটে সামান্য ফুটো করে **(Laproscopic Cholecystectomy)** অথবা পেট কেটে **(Open Cholecystectomy)** পিত্তথলিতে বা পিত্তনালী থেকে পাথর বা পাথরগুলি বের করে দেওয়া অথবা অস্ত্রপচার করে সম্পূর্ণ পিত্তথলি (Gall Bladder) কেটে বাদ দেওয়া
* উপরোক্ত পদ্ধতিতে (Pancreas procedures) অগ্ন্যাশয় থেকে তরল নির্গত করা (Drainage) এবং / অথবা নষ্ট হয়ে যাওয়া কোষগুলি নির্গত (Resection) করা
* মদের নেশার চিকিৎসা এবং মদ নির্ভরতা থেকে মুক্তি

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগের প্রতিকার (Prevention):

* মদ্যপান ত্যাগ অথবা নিয়ন্ত্রণ
* ধূমপান ছেড়ে দেওয়া
* জীবনশৈলীর পরিবর্তন (Lifestyle Changes) - দেহের সঠিক ওজন বজায় রাখা; তৈলাক্ত ও চর্বিজাতীয় খাদ্য কম খাওয়া; আহারে তাজা ফল ও শাকসবজির ভাগ বাড়ানো; নিয়মিত ব্যায়াম ও দৈহিক পরিশ্রম করা - এর ফলে রক্তে কোলেস্টেরল (Serum Cholesterol) ও ট্রাইগ্লিসারাইডের (Triglycerides) পরিমাণও কমে
* পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় জল খাওয়া

* পিত্তথলি, পিত্তনালীতে পাথর এবং অন্যান্য রোগ গড়ে ওঠার কারণগুলির চিকিৎসা

দীর্ঘমেয়াদি প্যানক্রিয়াটাইটিস (Chronic pancreatitis)

দীর্ঘমেয়াদি প্যানক্রিয়াটাইটিস হল এমন এক পরিস্থিতি যখন অগ্ন্যাশয় প্রদাহের কারণে গুরুতরভাবে এবং / অথবা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে ঠিকমত কাজ করতে পারে না (Pancreatic Insufficiency)।

* দীর্ঘমেয়াদি প্যানক্রিয়াটাইটিস এর কারণগুলি হল - বারংবার অগ্ন্যাশয়ের তীব্র প্রদাহ, প্রবল মদ্যপান, রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড এর অস্বাভাবিক মাত্রা বৃদ্ধি (Hypertriglyceridemia), রক্তে অস্বাভাবিক ক্যালসিয়াম এর মাত্রা বৃদ্ধি (Hypercalcemia), Cystic Fibrosis রোগ, অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার, যে পরিস্থিতিতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আক্রমণ করে (Autoimmune Diseases) সেই পরিস্থিতির উদয়, বংশগতিগত কারণে জিনের পরিব্যক্তি (Hereditary Gene Mutation)

* রক্তপরীক্ষা, পেটের প্রস্থচ্ছেদের ছবি, মল পরীক্ষা (Stool Elastase Test, Faecal Fat Analysis), অগ্ন্যাশয়ের কার্যকারিতা পরীক্ষা (Pancreatic Function Tests) – Serum Amylase, Serum Lipase, Secretin Stimulation Test, Endoscopic Pancreatic Function Testing (EPFT), Fat Absorption Tests, Imaging Tests ইত্যাদি

* দীর্ঘমেয়াদি প্যানক্রিয়াটাইটিস এর কারণে **Exocrine Pancreatic Insufficiency** হতে পারে। উপসর্গগুলি হল - ক্ষুধামান্দ্য, বমিভাব, বমি, জন্ডিস, রক্তচাপ হ্রাস, মলের সঙ্গে তৈলাক্ত পদার্থ (Fatty Poop) নির্গত হওয়া, ডায়াবেটিস এর লক্ষণসমূহ (**Glucagon** এর অভাবে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়া থেকে **Insulin** এর নিঃসরণ কমে যাওয়ায় রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়া থেকে Insulin নির্গত না হওয়ায় Type 1 Diabetes mellitus হওয়া), ক্ষুদ্রান্ত্র সঠিকভাবে খাদ্য (Food Particles) পরিপাক করে খাদ্যপ্রাণ (Nutrients) শোষণ করতে

না পারা (Malabsorption), ওজন হ্রাস, অপুষ্টি, ক্যানসার (মুলত Adenocarcinoma) প্রমুখ ব্যাধি

* দীর্ঘমেয়াদি প্যানক্রিয়াটাইটিসকে সারানো যায় না। তবে চিকিৎসা এবং সঠিক জীবনশৈলী অনুশীলনের মাধ্যমে উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ এবং পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ করা যায়

* কখনও চিকিৎসার প্রয়োজনে অগ্ন্যাশয়ের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ অস্ত্রপচার করে বাদ দেওয়া (Resection) অথবা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত অগ্ন্যাশয়টিকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে (Pancreatectomy)

* ডাঃ অমৃতা ব্যানার্জী, MD (Community Medicine)

মানব রক্তের স্বাভাবিক মাত্রা

* লোহিত রক্তকণিকা (RBC)	:	পুরুষ ৪৩-৫৯ লক্ষ/মিমি^{৩}
	:	নারী ৩৫-৫৫ লক্ষ/মিমি^{৩}
* শ্বেত রক্তকণিকা (WBC)	:	৪৫০০-১১০০০/মিমি^{৩}
* অনুচক্রিকা (Platelet)	:	১.৫-৪ লক্ষ/মিমি^{৩}
* হিমোগ্লোবিন (Hb%)	:	পুরুষ ১৩.৫-১৭.৫ গ্রাম/ডেসিলিটার
	:	নারী ১২-১৬ গ্রাম/ডেসিলিটার
* ই.এস.আর. (ESR)	:	পুরুষ ০-২০ মিলিমিটার/ঘণ্টায়
	:	নারী ০-৩০ মিলিমিটার/ঘণ্টায়
* সি-রিয়াকটিভ প্রোটিন	:	<০.৩ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার
* ব্লাড গ্লুকোজ	:	(খালি পেটে) ৭০-১০০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার
	:	(ভরা পেটে) <১৪০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার
* সেরাম অ্যামাইলেজ	:	৩০-১১০ ইউনিট/লিটার
* সেরাম লাইপেজ	:	১০-১৬০ ইউনিট/লিটার
* বিলিরুবিন (সম্পূর্ণ)	:	০.১-১.২ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার
* কনজুগেটেড বিলিরুবিন	:	<০.৩ মিগ্রা/ডেসিলিটার
* আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন	:	০.২-০.৮ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার
* এস.জি.পি.টি বা এ.এল.টি	:	১০-৪০ ইউনিট/লিটার
* এস.জি.ও.টি বা এ.এস.টি	:	১২-৩৮ ইউনিট/লিটার
* অ্যালকালাইন ফসফেটেজ	:	২৫-১০০ ইউনিট/লিটার
* ইউরিক অ্যাসিড	:	৩-৮.২ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার

সূত্রঃ এন.বি.এস.ই., এন.এল.এস প্রমুখ। এককে পরীক্ষাগারের এককের কিছুটা তারতম্য হতে পারে।

জন্ডিস ও ভাইরাল হেপাটাইটিস

প্রবীর পাল*

ন্যাবা বা পাণ্ডু বা কামলা রোগ অথবা জন্ডিস (Jaundice): সাধারণ ভাবে চোখের সাদা অংশ ও গায়ের চামড়া হলুদ এবং প্রস্রাব হলুদ হওয়াকে জন্ডিস বলে। রক্তে বিলিরুবিন নামক হলুদ রঞ্জক পদার্থ বেড়ে গেলে তা অক্ষিগোলকের সাদা অংশ বা স্ক্লেরায় জমা হয় এবং চোখ হলুদ দেখায়। স্ক্লেরার সাথে মুখের মিউকাস মেমব্রেন, গায়ের চামড়া এবং অন্যান্য কোষের মধ্যেও বিলিরুবিন জমতে থাকে এবং সেই অংশগুলো ক্রমশ হলুদ হয়ে ওঠে। বিলিরুবিনের মাত্রা বেশি হলে তা কিডনিতে ছাঁকনি হয়ে প্রস্রাবের সাথে নির্গত হয় এবং প্রস্রাব হলুদ দেখায়। এই অবস্থাগুলোকেই জন্ডিস বলা হয়।

ভাইরাল হেপাটাইটিস (Viral Hepatitis): পেটের উপরের ডানদিকে যকৃৎ বা লিভার থাকে। এই যকৃতের কোষের প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলে। অনেক কারণে হেপাটাইটিস হলেও নির্দিষ্ট কতকগুলো ভাইরাস মূলত, যকৃত কোষকেই আক্রমণ করে এবং ক্ষতবিক্ষত করে। এই ভাইরাসগুলো বিভিন্ন আকৃতির বা প্রজাতির হলেও এরা যকৃৎকোষের প্রদাহ ও ক্ষত অনেকটা একইরকমভাবে করে এবং উপসর্গগুলোও একইরকম হয়। এই ভাইরাসগুলোকে এ-জন্যে হেপাটাইটিস ভাইরাস বলে এবং রোগটিকে ভাইরাল হেপাটাইটিস বলা হয়।

সাধারণত, **হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি এবং ই**—এই পাঁচরকম হেপাটাইটিস ভাইরাস মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এর মধ্যে হেপাটাইটিস এ ও ই জলবাহিত এবং বাকিগুলি অর্থাৎ হেপাটাইটিস বি, সি ও ডি, রক্ত/ রক্তজাত পদার্থবাহিত বা যৌন সংসর্গ মারফত হয়। এই শেষোক্ত তিনটি আবার লিভার ক্যানসারের কারণ।

প্রথমে আমরা জন্ডিস কীভাবে হয় তা জানব—রক্তে বিলিরুবিন বেড়ে যাবার জন্যই জন্ডিস হয়। এখন দেখতে হবে বিলিরুবিন কী এবং কী কারণে রক্তে এর মাত্রা বাড়ে।

বিলিরুবিন (Bilirubin)—বিলিরুবিন হল সাধারণ পিত্তের রঞ্জক পদার্থ, তাই একে পিত্তরঞ্জকও বলা হয়। মানুষের রক্তের লোহিত কণিকা

১২০ দিন বাঁচে, তারপর এগুলো ভেঙে গিয়ে হিমোগ্লোবিন বেরিয়ে আসে। হিমোগ্লোবিন ভেঙে গিয়ে হিম (লৌহযুক্ত কণা) ও গ্লোবিন (প্রোটিন) তৈরি হয়।

হিমকণা (Haem)—রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল কোষের মধ্যে হিম-অক্সিজিনেজ নামক উৎসেচকের মাধ্যমে ভেঙে যায়। প্রথমে বিলিভার্ডিন এবং তার থেকে বিলিরুবিন তৈরি হয়। এই বিলিরুবিন রক্তে মিশে অ্যালবুমিন প্রোটিনের সাহায্যে যকৃৎ কোষে পৌঁছায়। কোষের মধ্যে গ্লুকোরোনিল ট্রান্সফাররেজ নামক উৎসেচকের সাহায্যে প্রথমে 'মনো' ও তারপর 'ডাই'-গ্লুকোরেনাইড নামক যৌগ বিলিরুবিন তৈরি করে। এই যৌগ বিলিরুবিন যকৃৎনালীর মারফত পিত্তথলিতে যায় এবং সেখান থেকে ক্ষুদ্রান্ত্র হয়ে বৃহদান্ত্রে যায়—এবং স্টারকোবিলিন-এ পরিণত হয়। এই স্টারকোবিলিনের জন্য পায়খানার রং হলুদ হয়। এই প্রক্রিয়া সাধারণভাবে নিরন্তর চলতে থাকে। সাধারণভাবে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা ০.৩ থেকে ০.৮ মিলিগ্রামের (প্রতি ডেসিলিটারে) মধ্যে থাকে।

কখন বিলিরুবিন বাড়ে এবং জন্ডিস হয়ঃ রক্তে ২ মিলিগ্রামের (প্রতি ডেসিলিটারে) বেশি বাড়লে চোখ হলুদ বা জন্ডিস হতে পারে।

১) **লোহিত রক্তকণা**—বেশি পরিমাণে ভাঙতে থাকলে বিলিরুবিন উৎপাদন বেশি হয় এবং রক্তের এর মাত্রা বাড়তে থাকে।—থ্যালাসেমিয়া, সিক্‌লসেল অ্যানিমিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

২) **জন্মগত ত্রুটি (Congenital)—**

ক) **গিলবার্ট সিনড্রোম, ক্রিশলার ন্যাজার বা রোটার সিনড্রোম**—প্রথম দুটিতে গ্লুকোরোনিল ট্রান্সফাররেজ উৎসেচক কম থাকে।

খ) **সদ্যোজাতের জন্ডিস (Neonatal Jaundice)**—জন্মের পরপরই যকৃৎ কোষের গ্লুকোরোনিল ট্রান্সফাররেজ উৎসেচক কম থাকে বলে অযৌগ বিলিরুবিন বাড়ে। সাধারণত আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। বিলিরুবিন খুব বেড়ে গেলে ফটোথেরাপি করা হয়।

৩) **হেপাটাইটিস** (মূলত ভাইরাল হেপাটাইটিস) রোগের জন্য—

ক) গ্লুকোরোনিল ট্রান্সফারেজ উৎসেচক ঠিকমতো কাজ না করার জন্য।

খ) যকৃৎ কোষ প্রদাহের ফলে মধ্যবর্তী সরু নালীর মধ্যে দিয়ে বিলিরুবিন যেতে পারে না এবং রক্তনালীর মধ্যে চলে যায়।

৪) **যকৃৎনালীর পাথর বা টিউমার**—বিলিরুবিনের অন্ত্রে যাবার পথ আটকে দেয় এবং রক্তে শোষণের ফলে যৌগ বিলিরুবিন বাড়ে।

৫) অন্যান্য—**সিরোসিস (Cirrhosis), অটোইমিউন হেপাটাইটিস,** অন্যান্য ভাইরাস বা সংক্রমণের জন্য **যকৃৎকোষের** ক্ষত হলেও জন্ডিস হয়।

আমরা এখানে শুধুমাত্র ভাইরাল হেপাটাইটিস নিয়ে আলোচনা করব।

ভাইরাল হেপাটাইটিস: হেপাটাইটিস ভাইরাসগুলো বিভিন্ন চরিত্রের হলেও এদের আক্রমণের পরের উপসর্গগুলো অনেকটা একই রকমের। যেমন—

১) **খিদে কমে যাওয়া**—চোখ হলুদ হবার কয়েকদিন আগে থেকেই খাবার ইচ্ছা কমে যায়। অরুচি হয় এবং অনেক সময় বিস্বাদ লাগে, প্রায়শই ধূমপায়ীদের ধূমপানের ইচ্ছাও চলে যেতে দেখা যায়।

২) **বমি**—অরুচির সাথে বমিভাব এবং অনেকক্ষেত্রেই বমি হয়। চোখ হলুদ হবার আগে থেকেই হতে পারে এবং জন্ডিস থকাকালীনও হতে পারে।

৩) **দুর্বলতা ও অবসাদ**—অবসাদ, শারীরিক দুর্বলতা এবং অল্পতে হাঁপিয়ে যাওয়া, বেশিরভাগ হেপাটাইটিস রোগীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

৪) **জ্বর**—চোখ বা প্রস্রাব হলুদ হবার দু-তিন দিন আগে থেকেই জ্বরভাব বা জ্বর হয়। সাধারণভাবে জ্বরের মাত্রা কম থাকলেও কখনো কখনো ১০৩ থেকে ১০৪ ডিগ্রি (ফারেনহাইট) জ্বর ওঠে। চোখ হলুদ হবার পর দু-চার দিনের মধ্যেই জ্বর কমে আসে।

৫) **পেট ব্যথা ও ভারী ভাব**—পেটের উপরের ডানদিকে যকৃৎ থাকে। এই জায়গাটায় ভারীভাব থাকে এবং এর উপর চাপ দিলে বা লম্বা শ্বাস নিলে ব্যথা হতে পারে। সাধারণত যন্ত্রণা হয় না।

৬) **মাথা ব্যথা ও যন্ত্রণা**—চোখের অক্ষিগোলকের পিছনে এবং গা, হাত, পায়ে ব্যথা থাকতে পারে। এগুলো পরে কমে যেতে দেখা যায়।

৭) **প্রস্রাব হলুদ**—চোখ হলুদ হবার চার-পাঁচ দিন আগে থেকেই প্রস্রাব হলুদ হতে শুরু করে। রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বাড়লে কিডনির ছাঁকনি হয়ে বিলিরুবিন প্রস্রাবে মেশে, ফলে তা হলুদ দেখায়। দিনের বেলা কাচের গ্লাসে দেখলে সহজেই বোঝা যায়। প্রস্রাবে পিত্তলবণ / পিত্তরঞ্জক (**Bile Salt-Bile Pigment)** পরীক্ষায় জন্ডিস বোঝা যায়।

(প্রস্রাবের সাথে যৌগ বিলিরুবিন বেরোতে পারে, এটি জলদ্রব (Water Soluble) তাই রক্তে ও প্রস্রাবে মেশে, অযৌগ বিলিরুবিন বেরোতে পারে না। সেজন্য থ্যালাসেমিয়া রোগীর চোখ হলুদ হলেও প্রস্রাব হলুদ হয় না)

৮) **চোখ হলুদ**—যৌগ ও অযৌগ দু-ধরনের বিলিরুবিনের মাত্রা বাড়লেই বিশেষ আকর্ষণের জন্য তা চোখের স্ক্লেরায় জমা হয় এবং এই সাদা অংশকে সহজেই হলুদ দেখায় (Icterus)। সাধারণত বিলিরুবিনের মাত্রা ২.৫ মিলিগ্রাম (প্রতি ডেসিলিটারে) বা তার বেশি হলেই চোখ হলুদ হতে শুরু করে। মাত্রা যত বাড়ে চোখ হলুদও তত গাঢ় হয়। আবার হেপাটাইটিস এবং বিলিরুবিন কমে গেলেও চোখের হলুদ ভাব বেশ কিছু দিন রয়ে যায়। স্ক্লেরা সহজে বিলিরুবিনকে ছাড়ে না, সেজন্য চোখ সাদা হতে কিছু দিন বাড়তি সময় লাগে।

৯) **মুখের মিউকাস মেমব্রেন হলুদ ও চামড়া হলুদ**—একই কারণে হয় এবং বিলিরুবিনের মাত্রা অনেকটা বাড়লে দেখা যায়।

১০) **চুলকানি**—যৌগ বিলিরুবিনের মাত্রা বেশি হলে বা অব্স্ট্রাকটিভ (**Obstructive**) জন্ডিসের ক্ষেত্রে চুলকানি বেশি হয়।

১১) **পায়খানার রং সাদাটে হয়ে যাওয়া**—অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস বা ঐ ধরনের হেপাটাইটিসের ক্ষেত্রে বিলিরুবিন পিত্তথলিতে এবং সেখান থেকে অন্ত্রে যেতে পারে না। ফলে স্টারকোবিলিন খুব কমে যায় এবং পায়খানার রং হলুদ হয় না, সাদাটে হয়ে যায়।

১২) **মারাত্মক উপসর্গ**—রক্তক্ষরণ ও মানসিক বিকৃতি। সাধারণত ফালামিনেন্ট হেপাটাইটিসে (**Fulminant Hepatitis**) এগুলো দেখা যায়। এইক্ষেত্রে তীব্র লিভার ব্যর্থতার (**Acute Liver Failure**) এর সঙ্গে হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি (**Hepatic Encephalopathy**), প্রতিবন্ধী প্রোটিন সংশ্লেষ (**Impaired Protein Synthesis**) প্রভৃতির লক্ষণগুলি দেখা যায়।

ক) **রক্তক্ষরণ**—যকৃৎ রক্ততঞ্চনকারী পদার্থগুলো (**Coagulation factors**), যথা ফিবরিনোজেন, প্রোথ্রমবিন, টিস্যু থ্রমবোপ্লাসটিন প্রভৃতি, তৈরি করে। যকৃৎ কোষ মারাত্মক জখম (ক্ষতবিক্ষত) হলে এগুলো তৈরি হতে পারে না, এবং পাকস্থলী, খাদ্যনালী, মুখের মাড়ি, নাক ও অন্যান্য জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ হয়। এসময়ে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। হাসপাতালে ভর্তি করে **Coagulation factor** ইনজেকশন দিতে হয়।

খ) **মানসিক বিকৃতি**—যকৃৎ কোষ ক্ষতবিক্ষত হলে রক্তের অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং মস্তিষ্কের কাজে বাধা দেয়। এক্ষেত্রে ভুল বকা, মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ না করা—এগুলো দেখা যায়। এক্ষেত্রেও হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হয়।

হেপাটাইটিস-এ

হেপাটাইটিস-এ ভাইরাস (HAV) আক্রমণ হলে তাকে **ভাইরাল হেপাটাইটিস**-এ বলা হয়। এই ভাইরাসটি হেপাটোভাইরাস জেনাস এবং পিকর্নভাইরাস ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত, আবরণহীন, সিঙ্গল স্ট্র্যান্ডেড (**Single Stranded**) আর.এন.এ. ভাইরাস। এর সাইজ মাত্র ২৭ ন্যানোমিটার।

ভাইরাসটি বাইরের তাপ, অ্যাসিড, ইথার বা সাধারণ ক্লোরিনেশনে মরে না। সুপার ক্লোরিনেশন পদ্ধতিতে এবং ফর্ম্যালডিহাইডে সহজে মারা যায়। এক মিনিট ফুটন্ত জলে এটি মারা যায়। শিম্পাঞ্জি বা কয়েকধরনের বানরের মধ্যে দেখা গেলেও এটা মূলত মানুষের মধ্যেই সংক্রামক।

কীভাবে ছড়ায়—আক্রান্ত ব্যক্তির পায়খানার সাথে এই ভাইরাস নির্গত হয় এবং তা পানীয় জল বা খাদ্যের মধ্যে মিশে দূষিত জল বা খাদ্যের মাধ্যমে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। ড্রেন বা পয়ঃপ্রণালীর জল পানীয় জলের লাইনে মিশে গেলে, নোংরা ফুচকার জল, পচা বা কাঁচা স্যালাডের মাধ্যমেও এই ভাইরাস সুস্থ মানুষের খাদ্যনালীতে যায় এবং সেখান থেকে যকৃতের সংক্রমণ হয়।

রোগের বৈশিষ্ট্য—আমাদের দেশের যেসব জায়গায় *স্যানিটারি ব্যবস্থা খুব খারাপ* সেখানে দশ বছরের নীচের বাচ্চাদের শতকরা ৯০ ভাগই হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়েছে ধরে নেওয়া হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সংক্রমণ হলে জন্ডিস বা অন্যান্য উপসর্গ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় না বা অনেক মৃদু হয়। এসব বাচ্চাদের দ্বিতীয়বার হেপাটাইটিস-এ সংক্রমণ হয় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ করতে যাওয়া মানুষের মধ্যে ইউরোপীয় এবং আমেরিকানদের জন্ডিস হলেও ভারতীয় সেনাদের খুব কমসংখ্যক আক্রান্ত হয়েছিল।

কিছুটা উন্নত স্যানিটারি ব্যবস্থায়—বড় বাচ্চাদের এবং বড়দের ক্ষেত্রে এই রোগ বেশি দেখা যায়। ছোটবেলায় সংক্রমণ না হবার জন্য এটা হয়। অপরিশ্রুত জলের ফুচকা, কুলফি, স্যালাড প্রভৃতি খাওয়ার কারণে সংক্রমণ বেশি হয়।

সুপ্তিকাল বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড—১৫ থেকে ৪৫ দিন। সাধারণ গড় ৩০ দিন। শরীরে ভাইরাসের প্রবেশ থেকে উপসর্গ (জন্ডিস) হওয়া পর্যন্ত

অবস্থাকে সুপ্তিকাল বলে। কত সংখ্যক ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করেছে এবং শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সুপ্তিকাল ও হেপাটাইটিসের তীব্রতা।

রোগের উপসর্গ ও তীব্রতা—জ্বর, গা ম্যাজমেজে ভাব, অবসাদ, বমি ও বমিভাব, খাবারে অরুচি এবং প্রস্রাব হলুদ ও চোখ হলুদ দিয়ে শুরু হয় এবং ক্রমশ গাঢ় হলুদ হয় (এগুলো আগে আলোচনা করা হয়েছে)। বয়সভেদে তীব্রতা বাড়ে।

	বাচ্চাদের ক্ষেত্রে	বড়দের ক্ষেত্রে
এই ইনফেকশনের জন্য জন্ডিস হয়:	৫ থেকে ২০ শতাংশ	৭৫ থেকে ৯০ শতাংশ
জন্ডিস হলে মৃত্যুহার:	০.১ শতাংশ	০.৩ থেকে ২.১ শতাংশ

এসব দিক থেকে দেখতে গেলে বাচ্চাদের হেপাটাইটিস ইনফেকশন হয়ে যাওয়া ভালো। বড়দের ক্ষেত্রে ৯৮-৯৯ ভাগ রোগী এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেও কিছু ক্ষেত্রে অনেক দিন এমনকি ছ-মাসের বেশি সময় ধরে হেপাটাইটিস থাকতে পারে। কখনো কখনো ভয়ানক ফালমিনেন্ট হেপাটাইটিস হতে পারে এবং রোগী মারা যেতে পারে।

রক্ত পরীক্ষা: **১) লিভার ফাংশন পরীক্ষা (LFT)**

ক) **বিলিরুবিনের মাত্রা**—যৌগ ও অযৌগ দু-ধরনের বিলিরুবিনই বাড়ে।

খ) **উৎসেচক**—এস.জি.পি.টি. ও এস. জি. ও. টি. **(SGPT, SGOT)**—উৎসেচকের মাত্রা চারশো থেকে চার হাজার ইউনিট পর্যন্ত হতে পারে। এস.জি.ও.টি.-র মাত্রা দেখে রোগটির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়।

গ) **ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন (BUN)**-এর পরিমাণ দেখে মস্তিষ্কবিকৃতি (এনকেফালোপ্যাথি) হতে পারে কিনা বোঝা যায়।

ঘ) **প্রোথ্রম্বিন টাইম**—বেশি হলে রক্তক্ষরণ হতে পারে কিনা বোঝা যায়।

২) **নির্দিষ্ট পরীক্ষা—আইজিএম অ্যান্টিবডি (IgM-Anti HAV)**-র উপস্থিতি থেকে হেপাটাইটিস-এ রোগের সংক্রমণ হয়েছে কিনা বোঝা যায়। সদ্য সংক্রমণের জন্য এটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা।

চিকিৎসা: ১) বিশ্রাম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক মাসের কাছাকাছি বিশ্রাম লাগে। সাধারণত এসজিপিটি একশোর নীচে না নামা পর্যন্ত বিশ্রাম প্রয়োজন হয়।

২) **নজরদারি রাখা**—রক্তক্ষরণ, ভুল বকা ও অন্য উপসর্গের উপর নজর রাখা।

৩) খাওয়া-দাওয়া স্বাভাবিক রাখা এবং চিকিৎসককে জানানো।

(গ্লুকোজ, আখের রস, অড়হর পাতা এগুলো না খেলেই ভালো)

রোগ প্রতিরোধ—১) **ভ্যাকসিন বা টিকা**—কার্যকরী টিকা আছে। প্রথমে একটা এবং ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ভ্যাকসিন নিলে জীবনভর প্রতিরোধ তৈরি হয় প্রায় ৯৫ শতাংশ।

২) **দূষিত জল ও খাদ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া খুব দরকার।**

ভাইরাল হেপাটাইটিস-ই

হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস সংক্রমণের জন্য হয়। এই ভাইরাসটি অর্থোমিক্রো ভাইরাস এর মধ্যে হেপাভাইরিডি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত আবরণহীন সিঙ্গল স্ট্র্যান্ডেড আরএনএ ভাইরাস। এর সাইজ ৩২ থেকে ৩৪ ন্যানোমিটার। হেপাটাইটিস-এ ভাইরাসের মতো সহজে মরে না। মূলত মানুষের মধ্যেই সংক্রমণ করে। এর চারটি সেরোটাইপের (Serotypes) মধ্যে এক এবং দুই নম্বর সেরো টাইপ আমাদের দেশে সক্রিয়। এই ভাইরাসটি আঞ্চলিক প্রাদুর্ভাবের (Endemic) সঙ্গে মহামারী (Epidemic) করার ক্ষমতা রাখে। সব থেকে বেশি **হেপাটাইটিস এপিডেমিক** হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস দিয়েই হয়।

কীভাবে ছড়ায়—সব দিক দিয়েই এই ভাইরাসের চরিত্র হেপাটাইটিস-এ ভাইরাসের মতোই। এটিও জলবাহিত রোগ। দূষিত পানীয় জলের মাধ্যমেই মূলত সংক্রমণ ঘটে। অনেক সময় মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

উপসর্গ—সাধারণত একটু বেশি বয়সের মানুষের বেশি সংক্রমণ দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই সেরে যায়। তবে খুব কম ক্ষেত্রে মারাত্মক ফালমিনেন্ট হেপাটাইটিস করতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী জন্ডিস বা হেপাটাইটিস করতে দেখা যায় না।

গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এই হেপাটাইটিস-ই সংক্রমণ খুব ভয়ানক হতে পারে। প্রায় কুড়ি শতাংশ মায়ের মৃত্যু হতে পারে। ভ্রূণ নষ্ট করলে মৃত্যুর সমস্যা কমে আসে।

রক্তপরীক্ষা: লিভার ফাংশন টেস্টে বিলিরুবিন ও উৎসেচক বাড়লে—**IgM Anti-HEV** (**আইজিএম-হেপাটাইটিক ই অ্যান্টিবডি**) পরীক্ষা করে

এই ভাইরাসের সংক্রমণ নির্দিষ্ট করা হয়। প্রোথ্রম্বিন টাইম ও ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন দেখে ভয়াবহতা হতে পারে কিনা (রক্তক্ষরণ ও এনকেফালোপ্যাথি) তা বোঝা যায়। একাধিকবার লিভার ফাংশান টেস্ট করে রোগটি কমছে কিনা বোঝা যায়।

চিকিৎসা: সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও নজরদারি রাখা। খাওয়া-দাওয়া স্বাভাবিক। গ্লুকোজ, আখের রস, অড়হর পাতা প্রভৃতি না খাওয়াই ভালো।

প্রতিরোধ: পরিশ্রুত পানীয় জল। দরকারে জল ফুটিয়ে খাওয়া।

ভ্যাকসিন: চীনে ২০১১ সালে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলেও ভারতে এর ব্যবহার হয় না।

ভাইরাল হেপাটাইটিস-বি

হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস সংক্রমণের জন্য হয়। এটি হেপাডনা ভাইরাস গ্রুপের দ্বিস্তর আবরণযুক্ত ডবল স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ (**Double Stranded DNA**) ভাইরাস। একে ডেন পার্টিকেলও বলা হয়। এর সাইজ ৪২ ন্যানোমিটার (**42nm**)। এই ভাইরাসের বাইরের দিকে থাকে **সারফেস অ্যান্টিজেন** এবং ভিতরের দিকে **নিউক্লিও ক্যাপসিড কোর**।

ক) **সারফেস অ্যান্টিজেন** (**HB_sAg**): ২২ ন্যানোমিটারের লম্বা বা গোলাকৃতি অ্যান্টিজেন বাইরের স্তরের এবং অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে। ৯৫ শতাংশ রোগীর রক্তে এর উপস্থিতি পাওয়া যায়। একটানা তিন মাসের বেশি উপস্থিতি থাকলে আক্রান্ত রোগী **ক্রনিক হেপাটাইটিস** (Chronic Hepatitis) রোগীতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এর **বিরুদ্ধ অ্যান্টিবডি—Anti HB_s** রক্তে পাওয়া গেলে রোগটি সেরে যাচ্ছে বা হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে বোঝা যায়। ৬ মাসের বেশি **HbsAg** রক্তে রয়ে গেলে তাকে ধারাবাহিক বাহক (**Chronic Carrier**) বলা হয়।

খ) **নিউক্লিও কাপসিড কোর** (**Nucleocapsid Core**): ২৭ ন্যানোমিটার কোরের মধ্যে থাকে ডিএনএ, ডিএনএ পলিমারেজ উৎসেচক, হেপাটাইটিস-বি কোর অ্যান্টিজেন এবং হেপাটাইটিস-বি-ই অ্যান্টিজেন (**DNA, DNA Polymerase, HbcAg** এবং **HbeAg**)। **HBV DNA, HbeAg** রক্ত প্রবাহে সঞ্চালিত হলেও **HbcAg** কেবলমাত্র যকৃৎ কোষে

সীমাবদ্ধ থাকে। প্রথম দুটির উপস্থিতি বা সংখ্যা দেখে সংক্রমণের মাত্রা এবং সংক্রমণ ক্ষমতা বোঝা যায়।

কীভাবে ছড়ায়ঃ একমাত্র **HBV DNA** বা ডেন কণাই সংক্রমণ করতে পারে। এটি আদতে ডিএনএ ভাইরাস হলেও রেট্রোভাইরাস (এইচ আই ভি ভাইরাস) - এর মতো করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এটি শরীরের বাইরে ৭ দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে এবং আধঘণ্টা অটোক্লেভ করলে বা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণে মারা যায়। আফ্রিকা ও অনুন্নত দেশের সাথে আমাদের দেশেও এর প্রকোপ বেশি। এটি পানীয় জল বা খাদ্য মারফত ছড়ায় না। রক্তে সঞ্চালিত ভাইরাসই অন্যকে সংক্রমিত করে।

ক) **রক্ত ও রক্তজাত পদার্থ সঞ্চালন**—মূল মাধ্যম হলেও বর্তমান বাধ্যতামূলক **HbsAg** পরীক্ষা করে দূষিত রক্তকে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে এই মাধ্যমে সংক্রমণ কমে এসেছে। তবে নিম্নমানের কিট হলে সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

খ) **ইনজেকশনের সূচ**—আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সূচ থেকে সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে সহজেই সংক্রমিত হতে পারে। মাত্র ০.০০০০১ মিলিলিটার সংক্রমিত রক্ত রসই (Serum) সংক্রমণের জন্য যথেষ্ট। একবার ব্যবহারের পর সিরিঞ্জ ও সূচ নষ্ট করে ফেলতে হয়। আরজিকর কাণ্ডের পর ভয়ানক অসাধু চক্রের কথা শোনা যাচ্ছে যাঁরা অর্থের বিনিময়ে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পাচার করে—যা আবার ব্যবহৃত হয়।

গ) **অপারেশনের** বা দাঁত তোলার জন্য অশোধিত যন্ত্র মারফতও সংক্রমণ ছড়াতে পারে। কোয়াক ডাক্তার বা স্বল্প শিক্ষিতরাই মূলত এ-কাজ করে থাকেন।

ঘ) **চুল-দাড়ি কাটার সময়** অশোধিত ক্ষুর ব্যবহার করলে সংক্রমণ হতে পারে।

ঙ) **ট্যাটু করা,** কানে দুল পড়ার জন্য কান ফুটো করার সময় অশোধিত যন্ত্র বা সূচ ব্যবহার।

চ) যৌন সংসর্গ—সমকামী (Homosexual), উভকামী (Bisexual) এবং নারীপুরুষ স্বাভাবিক যৌনমিলনের (Heterosexuals) সময় আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে সহজেই সংক্রমণ ছড়াতে পারে (এইচআইভি-র মতো)। ট্রাক ড্রাইভার, পরিযায়ী, যৌনপল্লীতে যাতয়াত করা ব্যক্তিদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। কনডোম ব্যবহার করলে সংক্রমণের সম্ভাবনা একেবারে কমে যায়।

ছ) **মা ও শিশু**—আক্রান্ত বা ক্রনিক কেরিয়ার মায়ের থেকে শিশুর সংক্রমণ এখন সংক্রমণের বড়ো জায়গা। শিশু জন্মের সময় জন্মদ্বার অতিক্রম করার সময়ই মূলত সংক্রমণ ঘটে। সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের **HbsAg** পরীক্ষা এবং সেইমতো বাচ্চা জন্মের পরপরই ইমিউনো-গ্লোবিউলিন ও ভ্যাকসিন দিয়ে বাচ্চার সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়।

উপসর্গ—অন্যান্য হেপাটাইটিসের মতো জ্বর। খিদে কমে যাওয়া। বমিভাব বা বমি। প্রস্রাব হলুদ ও চোখ হলুদ হলেও এই সংক্রমণের তীব্রতা কিছুটা বেশি। অনেক ক্ষেত্রেই এটি সেরে যায় এবং মাত্র ০.১ শতাংশ **ফালমিনেন্ট হেপাটাইটিস** হয়। বয়স বেশি হলে রোগের তীব্রতা বেশি হয়।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রোগের তীব্রতা কমে গেলেও এই ভাইরাসটি বহনকারী অবস্থা বা **ক্রনিক কেরিয়ার** হয়ে শরীরে রয়ে যেতে পারে। ছ-মাসের বেশি রয়ে গেলে তাকে বহনকারী অবস্থা বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উপসর্গ ছাড়াই সংক্রমণ হয় এবং বহনকারী অবস্থায় পৌঁছায়। মা থেকে শিশুর সংক্রমণের ৯০ শতাংশের বেশি ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়।

এই বহনকারীদের চার থেকে কুড়ি শতাংশ ব্যক্তির প্রতি পাঁচ বছরে **সিরোসিস** নামক ক্রনিক লিভার ডিজিজ হতে পারে। এর মধ্যে প্রতিবছর ১ থেকে ৫ শতাংশ **যকৃৎ ক্যান্সারে** আক্রান্ত হয়। প্রায় ১৫ শতাংশ রোগী পাঁচ বছরের মধ্যে মারা যেতে পারে। হেপাটাইটিস-বি সংক্রমিত ব্যক্তির হেপাটাইটিস-সি বা ডি ইনফেকশন হলে মৃত্যুহার খুব বেড়ে যায়। মদ্যপানও ঝুঁকি বাড়ায়।

রক্ত পরীক্ষা—বিলিরুবিন, উৎসেচক (লিভার ফাংশন টেস্ট)-এর পাশাপাশি সাধারণ রক্তপরীক্ষা, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন (BUN) এবং প্রোথ্রম্বিন টাইম পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

নির্দিষ্ট পরীক্ষা: **HbsAg** পরীক্ষাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যথেষ্ট। কিছু ক্ষেত্রে **IgM Anti Hbc** পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। **HbeAg** অ্যান্টিজেন দেখে রোগটির সংক্রমণ ক্ষমতা বোঝা যায়। আক্রান্ত মা, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে এটি পরীক্ষা করা যেতে পারে। **AntiHbs** অ্যান্টিবডির উপস্থিতি দেখে রোগটি সেরে যাচ্ছে কিনা বা প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখা হয়।

ক্রনিক কেরিয়ার বা বহনকারী রোগীর রক্তে **HbsAg** পাওয়া যায় এবং **AntiHbs** অ্যান্টিবডি থাকে না। এদের রক্ত পরীক্ষায় **HBV DNA** বা ভাইরাসের সংখ্যা এবং **HbeAg**-র উপস্থিতি থেকে সিরোসিস হবার সম্ভাবনা। তাই চিকিৎসা শুরু করা হয়। **HbcAg** কেবলমাত্র যকৃৎ কোষে থাকে।

চিকিৎসা: অ্যাকিউট হেপাটাইটিস: অন্যান্য হেপাটাইটিসের মতো বিশ্রাম ও নজরদারি এবং উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়।

ক্রনিক বা কেরিয়ার হেপাটাইটিস: **HBV DNA**-র সংখ্যা বৃদ্ধি দেখে **অ্যান্টিভাইরাল** ওষুধ বা **ইন্টারফেরন** বা দুটোই একত্রে ব্যবহার করা হয়। **টেনোফোভির, এন্টেকাভির, এডেফোভির**—প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। লিভারে সিরোসিস হয়ে গেলে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের সাথে সিরোসিসের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করতে হয়

প্রতিরোধ: ১) রক্ত, রক্তজাত পদার্থ সঞ্চালন, ইনজেকশনের সূচ, সিরিঞ্জ ও অন্যান্য মাধ্যমগুলো এবং নিরাপদ যৌনতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়।

২) **ভ্যাকসিন**—আগে ভ্যাকসিন নেওয়া না থাকলে ০, ১ ও ৬ মাস পর তিনটি ডোজ সাধারণত দেওয়া হয়। আগে নেওয়া থাকলে **AntiHbs** অ্যান্টিবডির মাত্রা দেখে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে কিনা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

সংক্রমিত মায়েদের ভাইরাসের সংখ্যা বেশি থাকলে (**HBV DNA > $2x10^5$ ml)** টেনোফোভির জাতীয় অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ দেওয়া হয়। গর্ভাবস্থার শেষ তৃতীয়াংশে (**3rd Trimester),** বাচ্চা জন্মের পরে এক ডোজ ইমিউনোগ্লোবিউলিন (**HBIG-0.5ml)** উরুতে দিতে হয়। ১২ ঘণ্টার মধ্যে ভ্যাকসিন ডোজ দেওয়া হয় অন্যান্য ভ্যাকসিনের সাথে। তিনটে ডোজ দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে জন্মের পরের ডোজ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডোজ ডি.পি.টি-র প্রথম ও তৃতীয় ডোজের সাথেও দেওয়া যায়। এখন পেন্টাভ্যালেন্টের সাথে।

অসাবধানতা বশত ইনজেকশনের সূচ ফুটে গেলে ৬ ঘণ্টার মধ্যে (অন্তত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে) ০.০৫ থেকে ০.০৭ মিলি প্রতি কেজি ওজনে **HBIG** এবং ভ্যাকসিন নিতে হয়। **Anti Hbs** বেশি থাকলে প্রয়োজন হয় না।

হেপাটাইটিস-ডি

ডেল্টা ভাইরাস গ্রুপের আবরণ যুক্ত, অসম্পূর্ণ আরএনএ ভাইরাস। সাইজ ৩৫ থেকে ৩৭ ন্যানোমিটার। ভিতরে সিঙ্গল স্ট্র্যান্ডেড আরএনএ যুক্ত **HDV** (ডেল্টা ভাইরাস) কোর এবং তার চারপাশে হেপাটাইটিস-বি সারফেস অ্যান্টিজেন (**HbsAg)** দিয়ে ঢাকা থাকে। **হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণ হলে তবেই হেপাটাইটিস-ডি ইনফেকশন হতে পারে। সেজন্য এদের একত্রে**

হাইব্রিড ভাইরাসও বলা হয়। আবার অসম্পূর্ণ ভাইরাসটিকে ভাইরয়েডের মতো মনে হয়।

কীভাবে ছড়ায়: হেপাটাইটিস-বি-র মতো রক্ত, রক্তজাত পদার্থ, ইনজেকশন এবং যৌন সংসর্গ মারফত সংক্রমণ হয়।

সুপ্তিকাল: ৩০ থেকে ১৮০ দিন (গড় ৬০ থেকে ৯০ দিন)

বৈশিষ্ট্য: শুধুমাত্র হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণের ক্ষেত্রে মাত্র ০.১ শতাংশ মারাত্মক ফালমিনেন্ট হেপাটাইটিস হলেও তার উপর ডেল্টা হেপাটাইটিস সংক্রমণ হলে ৫ থেকে ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে এটা হতে পারে এবং মারা যাবার সম্ভাবনাও অনেকটা বেড়ে যায়। আবার একসাথে বি ও ডি ইনফেকশন থাকলে অর্থাৎ বহনকারী 'বি' হেপাটাইটিসের উপর 'ডি' সুপার ইনফেকশন হলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ক্রনিক লিভার ডিজিস (সিরোসিস) হয় এবং ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

রক্ত পরীক্ষা:

ক) **অ্যাকিউট ইনফেকশন**: **IgM Anti HDV + HbsAg**

খ) **ক্রনিক ইনফেকশন**: **IgM Anti HDV + HbsAg** এবং **IgG Anti HDV**

চিকিৎসা: উপসর্গ মাফিক এবং হেপাটাইটিস-বি রোগের মতো।

প্রতিরোধ: হেপাটাইটিস-বি-এর মতোই। রক্ত সঞ্চালন, সূচ ও আনুষঙ্গিক যৌনজীবন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা।

ভ্যাকসিন: আলাদা কোনো ভ্যাকসিন নেই। হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন নিয়ে প্রতিরোধ করলে এই রোগটা হতে পারবে না। বহনকারী হেপাটাইটিস-বি ব্যক্তিকে 'বি' ভ্যাকসিন দিয়ে লাভ নেই।

হেপাটাইটিস-সি

ফ্ল্যাভিভাইবিডির মধ্যে, হেপাসিভাইরাস গ্রুপের আবরণ যুক্ত সিঙ্গল স্ট্র্যান্ডেড আরএনএ ভাইরাস। সাইজ ৫৫ ন্যানোমিটার। এটি আরএনএ ভাইরাস হলেও বিভিন্ন দিক দিয়ে হেপাটাইটিস-বি-এর মতোই মারাত্মক ও ক্ষতিকারক।

কীভাবে ছড়ায়: মূল রক্ত ও রক্তজাত দ্রব্য সঞ্চালন ও ইনজেকশনের সিরিঞ্জ বা সূচ মারফত ছড়ায়। মা থেকে শিশুর সংক্রমণ ও যৌন সংসর্গ মারফতও সংক্রমণের সম্ভাবনা কম। জল বা খাদ্য মারফত ছড়ায় না।

উপসর্গ: শতকরা ৮০ ভাগের ক্ষেত্রে কোনো উপসর্গ হয় না। বাকিদের

ক্ষেত্রে অন্যান্য হেপাটাইটিসের মতো জ্বর, খিদে কম, বমি, হলুদ প্রস্রাব ও হলুদ চোখ বা জন্ডিস দেখা যায়। ১৫ থেকে ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে আপনা-আপনিই সেরে যায়। মাত্র ০.১ শতাংশ ক্ষেত্রে ফালমিনেন্ট হেপাটাইটিস হয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। বাকি ৫৫ থেকে ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে **ক্রনিক ইনফেকশন** থেকে যায়। এর মধ্যে ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ ব্যক্তি ২০ বছরের মধ্যে **ক্রনিক লিভার ডিজিজ/সিরোসিস** আক্রান্ত হয়।

সুপ্তিকাল—১৫ থেকে ১৬০ দিন। গড়ে ৫০ দিন।

রক্ত পরীক্ষা—লিভার ফাংশন টেস্টের সাথে নির্দিষ্ট পরীক্ষা করা হয়

অ্যাকিউট: Anti HCV RNA (অ্যান্টিবডি পরীক্ষা)—**immunoassay**। **HCV RNA**—ভাইরাসের উপস্থিতি (**PCR পরীক্ষায়)**

ক্রনিক: এই পরীক্ষাগুলো ৬ মাসের বেশি পজিটিভ থাকলে ক্রনিক ইনফেকশন।

চিকিৎসা: অ্যাকিউট ইনফেকশনের ক্ষেত্রে চিকিৎসা অন্যান্য হেপাটাইটিস রোগীর মতোই। ক্রনিক রোগীর ক্ষেত্রে ইন্টারফেরন ও ডিরেক্ট অ্যান্টিভাইরাল এজেন্ট (**DAA),** একাধিক নতুন অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ একত্রে নিয়মমাফিক প্রয়োগ করলে রুগি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেতে পারে। তবে ওষুধগুলো অনেকটা দামি।

প্রতিরোধ: রক্ত সঞ্চালনের আগে বাধ্যতামূলক **Anti HCV** অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করা হয় এবং সংক্রমণের সূচ, চুল-দাড়ি কাটার সরঞ্জাম পরিশোধন করা এবং হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধের মতো অন্যান্য ব্যবস্থা নিলে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

ভ্যাকসিন: এখনো কার্যকর ভ্যাকসিন নেই।

---

* ডা: প্রবীর পাল, বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।

নিরাপদ খাবারের জন্য

* পরিচ্ছন্নতা
* কাঁচা ও রান্না করা খাবারের পৃথকীকরণ
* ভালো করে রান্না করা
* সঠিক তাপমাত্রায় খাবার রাখা
* পরিশ্রুত জল ও ভালো গুণমানের খাদ্যসামগ্রীর ব্যবহার

হেপাটাইটিস বি এর গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ

HbsAg	Anti-HBs	Anti-HBc	HBeAg	Anti-HBe	Hepatitis B
+	–	IgM	+	–	তীব্র সংক্রমণ
+	–	IgG	+	–	ধারাবাহিক সংক্রমণ ও ভাইরাস বৃদ্ধি
+	–	IgG	–	+	ধারাবাহিক সংক্রমণ ও ভাইরাসের বৃদ্ধি হ্রাস
+	+	IgG	+/–	+/–	ধারাবাহিক সংক্রমণ
–	–	IgM	+/–	+/–	তীব্র সংক্রমণ
–	+	IgG	–	+/–	আরোগ্যর পথে
–	+	–	–	–	প্রতিরোধী অবস্থা (টিকাকরণ জনিত)
–	–	IgG	–		অতীত সংক্রমণ

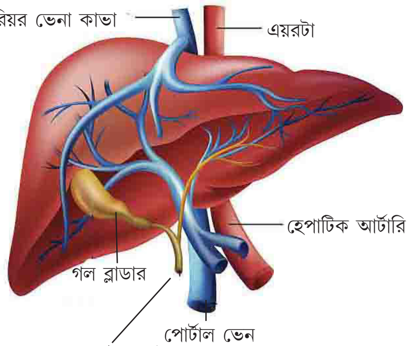

যকৃৎ (Liver)

* দেহের অন্যতম প্রধান ও বৃহৎ অঙ্গ
* ওজন প্রায় দেড় কি.গ্রা.
* কাজ: রক্ত ও পিত্ত সঞ্চালন; বিপাক (Matabolism); রক্ত, লসিকা ও রক্ত জমাট বাধার উপাদান তৈরি; দেহকে পরিষ্কার রাখা (Detoxification); প্রোটিন ও খাদ্য প্রাণ তৈরি; ইনসুলিন, হর্মোন ইত্যাদি সংশ্লেষ; রক্ত সংরক্ষণ প্রভৃতি

লিভারের গল্প: সিরোসিস অফ লিভার

কালিদাস বিশ্বাস*

কমলবাবু আমাদের পাশের বাড়ির নির্বিরোধ প্রতিবেশী। নেশাভান করতেন বলে শুনিনি। মাঝরাতে বৌদির ফোনে তার বাড়ি গেলাম। মেঝেতে ভর্তি রক্ত। উনি তার মধ্যে শুয়ে। রক্তচাপ কমে গেছে। নাড়ির গতি (Pulse Rate) দ্রুত। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। রক্ত দেওয়া হলো তিন বোতল। সে যাত্রায় তিনি রক্ষা পেলেন। তবে ডাক্তাররা বললেন সিরোসিস অফ লিভার **(Cirrhosis of Liver)**। **Advanced Fibrosis of Liver Stage**—চিকিৎসা সারাজীবন চলবে। তা চলুক। কিন্তু আমরা জানতাম মদ বেশি খেলে সিরোসিস লিভার হয়। জানা গেল, **হেপাটাইটিস বি** এবং **সি**, এমনকি **ফ্যাটি লিভার ডিজিস** থেকেও সিরোসিস লিভার হতে পারে।

কথা হলো সিরোসিস লিভার কি? লিভারে কি হয়? বহতা নদী যেমন এক পাড় ভেঙে অন্যপাড় গড়ে, তেমনই, সিরোসিস লিভারে লিভারের কোষের পচন এবং বেপরোয়া গড়ন একই সাথে চলে। ডাক্তারি ভাষায়—Degeneration and Regeneration–Unregularised। সাধারণভাবে এটা একটা ধীরগতির শারীরিক পরিবর্তন। অর্থাৎ একমাসে এটা হয় না। শরীর সব সময় চেষ্টা করে স্বাভাবিক থাকার এবং যোঝার। হয়তো তাই প্রথমদিকে তেমন নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ থাকে না। ফলে ডাক্তার এবং রোগী কেউ বুঝতে পারে না। একটু দুর্বলতা, একটু 'ভাল্লাগাছে না', একটু খিদে কমে যাওয়া—সাংসারিক মানুষরা খুব একটা পাত্তা দেন না। কখন ডাক্তারের কাছে যান—যখন পা ফোলে, পেট ফোলে, Jaundice দেখা যায় অথবা ওজন দ্রুত কমে যায়। কিন্তু ততদিনে শরীরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

আমরা জানি ধমনী অক্সিজেন যুক্ত রক্ত এবং শিরা কার্বন ডায়-অক্সাইড যুক্ত রক্ত বহন করে। ব্যতিক্রম আছে। লিভারের প্রধান পুষ্টি এবং অক্সিজেন সরবরাহকারী হলো যথাক্রমে পোর্টাল ভেন **(Portal Vein)** এবং হেপাটিক আর্টারি **(Hepatic Artery)**। আরেকটি শিরাও সাহায্যকারী হিসাবে থাকে, এ ব্যাপারে। তার নাম হেপাটিক পোর্টাল ভেন (Hepatic Portal Vein)। যেখানে ৮০% কাজ করে এই সরবরাহে পোর্টাল ভেন, সেখানে হেপাটিক আর্টারি করে শতকরা বিশ ভাগ। যখন সিরোসিস অফ লিভার হয়, লিভারের

গঠনগত পরিবর্তন হয়। তার জন্যে যেমন লিভারের বাইরে থেকে ডেলা বা পিণ্ড **(Nodule)** বোঝা যায়, তেমনি মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখলে গঠনগত জটিলতা বোঝা যায়। ফল হিসাবে পোর্টাল ভেনের চাপ (Pressure) বেড়ে যায় পাঁচ মিলিমিটার মার্কারি (Hg) এবং বেশি। এই অবস্থাকে বলা যায় পোর্টাল হাইপারটেনশন **(Portal Hypertension)**।

পোর্টাল হাইপারটেনশনের ফলে লিভারের কর্মক্ষমতা কমে যায়। মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে পারে, মলদ্বার দিয়ে রক্ত বেরোতে পারে। পেট ফুলে বা পেটে জল জমে (**Ascites**) যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন উঠে আসে। শুধুমাত্র লিভারের মধ্যে অসুখেই কি পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়? তা নয়। লিভারের বাইরেও যখন পোর্টাল ভেন অবরুদ্ধ (Block) হয়, তখনও পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়। এই অসুখের খটোমটো নামটি **Extra Hepatic Portal Venous Obstruction**। অনেক সময় এই অসুখে লিভারের অবস্থা তত খারাপ হয় না। লিভারের মধ্যে পোর্টাল হাইপারটেনশনের কারণে লিভারের আনুবীক্ষণিক গঠন বিভিন্ন স্তরে থাকতে পারে। এটা **Pre-Sinusoidal, Sinusoidal** এবং **Post Sinusoidal** অর্থাৎ লিভারে ঢোকার আগে পোর্টাল ভেনে, লিভারের মধ্যে রক্তজালিকায় এবং লিভারের মধ্যে রক্তজালিকা পরবর্তী হেপাটিক ভেন **(Hepatic Vein)**এ অবরোধ (Obstruction) তৈরি হয়। লিভারে বিভিন্ন আঘাত এবং অত্যাচার (injury and insult) এর ফলে লিভারের কোষে স্বাভাবিক যকৃৎ কোষগুলি (Healthy Hepatocytes) শক্ত ছিবড়ে **(Fibrotic Scar)** ও পুনর্গঠিত ডেলায় **(Regenerative Nodules)** পরিণত হয়।

কে না জানে আমাদের যে LIVE করায় তার নামই LIVER। তাই লিভারের সুস্থতার উপরে সারা শরীরের সুস্থতা অনেকটা নির্ভরশীল। একই সাথে অতি সরলীকৃতভাবে, এটা বলা যেতে পারে যে পোর্টাল প্রেশার যখন বেড়ে যায়, তখন পেটের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় পোর্টাল সিস্টেম এবং সাধারণ যে ব্যবস্থা হয়েছে তাদের সংযোগস্থলের যোগসূত্র **(Anastomosis)** ফুলে ওঠে। সেই ফুলে ওঠা লিভারের অনেকাংশে পরিণতি হল ফেটে যাওয়া (Rupture)। শারীরিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পোর্টাল ভেনের সংযোগ ফেটে যাওয়ার জন্যে পোর্টাল ভেনের প্রেশার বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে অন্য সিস্টেমের সঙ্গে প্রেশারের তারতম্য দায়ী।

প্রকৃতপক্ষে পোর্টাল হাইপারটেনশন থেকে তিনটি জটিলতা বেশি দেখা যায়। প্রথমটি হল রক্তবমি **(Hematemesis)** এবং/অথবা কালো পায়খানা

(Melena), দ্বিতীয়টি উদরী **(Ascites)** এবং তৃতীয়টি হল লিভার সম্পর্কিত মস্তিষ্কের জটিলতা। যার নাম **Hepatic Encephalopathy**। এই অসুখে লিভার যে বর্জ্য পদার্থগুলি মলের সাহায্যে দেহের বাইরে পাঠায়, সেই প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং আরো কিছু রাসায়নিক রক্তে বেশি উপস্থিতির কারণে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তথা চেতনাকে ব্যাহত করে। রোগী যেন নিজের মধ্যে থাকেন না—ভুলভাল কথা বলেন, কাঁপতে থাকেন, এমনকি কোমাতেও **(Coma)** পৌঁছে যেতে পারেন। এটি একটি আপৎকালীন **(Emergency)** অবস্থা। চিকিৎসায় উন্নতি সম্ভব। তার আগে এগুলি কি কারণে হয় সেদিকে একটু তাকাই।

কি কি কারণে সাধারণত **পোর্টাল হাইপারটেনশন** হয়? সবচেয়ে বেশি দেখা যায় **সিরোসিস অফ লিভারে**। এছাড়াও লিভারের বাইরে পোর্টাল ভেনের ব্লক হয়ে **Extrahepatic Portal Venous Obstruction বা Thrombosis** হতে পারে। অজ্ঞাত কারণে পোর্টাল প্রেশার বেড়ে যেতে পারে (**Idiopathic Portal Hypertension**)। হৃদযন্ত্রের ও লিভারের দুর্বলতার কারণে লিভারে Cardio Hepatic Fibrosis হতে পারে। এবং একটি কৃমি ঘটিত রোগ সিস্টোসোমিয়াসিস (Schistosomiasis) সহ আরও অনেক কারণই আছে। কারণ তো কিছু জানা গেল। করবটা কি?

করার রাস্তা—ওষুধ দিয়ে দেখা। বিটা ব্লকার (**Beta Blocker**) খুবই উপযোগী। রক্তক্ষরণ হলে **Somatostatin**-জাতীয় ওষুধ। এন্ডোস্কোপির (**Endoscopy**) সহযোগেও অনেক কার্যকর চিকিৎসা করা হয়। সবচেয়ে বেশি করা হয়—ফুলে ওঠা শিরাগুলি বেঁধে দেওয়া (**Endoscopic Variceal Ligation**)। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে আরও নতুন পদ্ধতি এসেছেও। সার্জেনদের ভূমিকা থাকে, বিশেষত ওষুধ যখন আর কাজ করতে পারছে না। তবে অসুখের মূলোৎপাটন করতে গেলে দরকার অসুখের উৎস যে লিভার, সেটিকে বদলে ফেলা **(Liver Transplantation)**। এটি কোনো মুখের কথা নয়। কাকে করব আর কে নিতে পারবে (Patient Selection) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দাতার (Doner) দান করার ক্ষমতা আছে কি-না, তাও দেখা হয়। অপারেশন পরবর্তী অনেক জটিলতা থাকতে পারে এবং হয়-ও। ব্যয়ের কথা যদি বাদও দিই।

এত কিছুর থেকে অব্যহতি পাওয়ার রাস্তা রয়েছে **প্রতিরোধের (PREVENTION)** উপরে। অর্থাৎ যুদ্ধ করব না, যুদ্ধ করতে পারি না তা

নয়, যুদ্ধ হতে দেব না। এটা যদি করতে হয় তাহলে বর্তমানে চারটি কর্তব্য জরুরি। প্রথমটি হল, **হেপাটাইটিস বি টিকাকরণ (Hepatitis B Vaccination)**—যা ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করছেন। দ্বিতীয়টি হল **মদ খাওয়ার প্রবণতা কমানো**—যার জন্য জন-সচেতনতার কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে এবং এটাকে সমস্ত বয়সের এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে করতে হবে। তৃতীয়ত, অস্বাস্থ্যকরভাবে মোটা হয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা গোটা বিশ্বে এবং ভারতে চলছে **(GLOBESITY)**, তা প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা এবং চতুর্থত, ডায়াবেটিস থাকলে **ডায়াবেটিসের চিকিৎসা** করা। স্বাস্থ্যকর্মী এবং সমাজকর্মীদের এ ব্যাপারে আরও সক্রিয় ভূমিকা দরকার। স্বাস্থ্য যে সত্যিই সম্পদ এবং সবচেয়ে বড় সম্পদ, এটা আমরা ভুলে যাই। এটাকে মনে রাখতে হবে এবং মনে করাতে হবে।

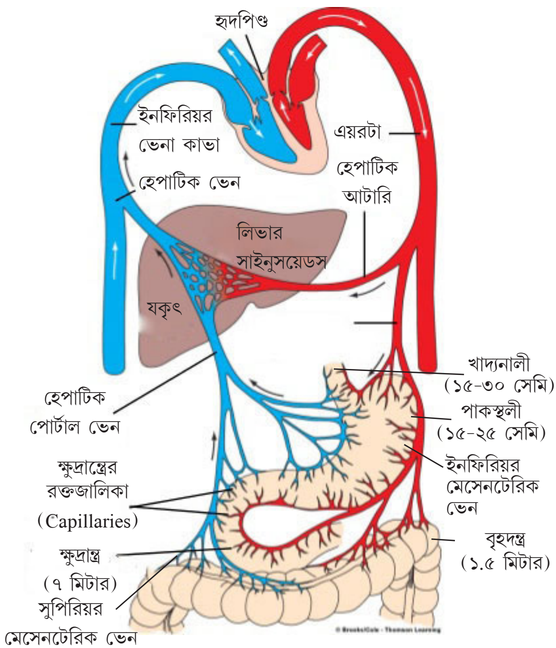

পোর্টাল সংবহনতন্ত্র (Portal Circulation)

---

* ডাঃ কালিদাস বিশ্বাস, বিশিষ্ট গ্যাসট্রো এন্টারলজিস্ট

ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজ (আই বি ডি)

অরিজিৎ সিনহা*

ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজ একটি খাদ্যনালীর প্রদাহ জাতীয় অসুখ। এটি দীর্ঘস্থায়ী অসুখ (Chronic Disease), কখন কখন তীব্র অভিব্যক্তি (Acute Manifestation) হয়। এই অসুখের দুটি প্রধান ধরন—**আলসেরেটিভ কোলাইটিস** আর **ক্রোন্স ডিজিজ**। অন্য ধরনটি হল আই বি ডি ইউ অর্থাৎ **আনডিফারেনসিয়েটেড**। এটি উন্নত নগর সভ্যতার অসুখ। ইউরোপ এ এর প্রকোপ বেশি, আফ্রিকা এশিয়া র তুলনায়। কিন্তু নগর সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকা এশিয়া তে এর প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। এই ধরনের রোগ ছেলেদের ও জীবনের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দশকে বেশি দেখা যায়। ধূমপায়ী ও যাদের আপেন্ডিক্স অপারেশন হয়েছে তাদের মধ্যে আলসেরেটিভ কোলাইটিস কম দেখা যায়। আবার ক্রোন্স ডিজিজ ধূমপায়ীদের মধ্যে বেশি।

এই ধরনের অসুখ কেন হয় নির্দিষ্ট ভাবে বলা কঠিন। স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্যনালীর ভিতরে **মাইক্রোবাইওটা** (অনুজীবাণু), **এপিথিলিয়াল সেল** (আবরণী কোষ) ও **ইমিউন সেল** (প্রতিরোধী কোষ) এক ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। বিভিন্ন কারণে যখন এই ভারসাম্য নষ্ট হয় তখন প্রতিরোধী কোষ নিজের জিনিস কে পর ভেবে আক্রমণ করে **(অটোইমিউনিটি)**, সূচনা হয় অসুখের। পরিবেশ জনিত কারণ যেমন—খাদ্যাভাস, মানসিক চাপ, ধূমপান, অ্যানালজেসিক বা অ্যান্টিবায়োটিক বেশি ব্যবহার, নির্দিষ্ট জিনের প্রভাব, মাইক্রোবাইওটা র পরিবর্তন, প্রতিরোধ ব্যবস্থার বেনিয়ম এই রোগের কারণ বা প্যাথজেনেসিস এর মধ্যে পরে।

আলসেরেটিভ কোলাইটিস অসুখটি ৪০ থেকে ৫০ ভাগ লোকের **মলদ্বার বা রেক্টাম ও সিগময়েড কোলন**, ৩০ থেকে ৪০ ভাগে তারও উপরের দিকে, ২০ ভাগ ক্ষেত্রে সমগ্র বৃহদান্ত্র **(Colon or Large Intestine)** জুড়ে হয়। এটি কোলনের স্তর এর উপরের অংশ অর্থাৎ মিউকোসা ও সাব মিউকোসা তে সীমাবদ্ধ থাকে, যা খালি চোখে স্যান্ডপেপার এর মত দেখতে হয়। সেজন্য পলিপ তৈরি হতে পারে কিন্তু অন্ত্রর মধ্যেটা আটকে যায় না বা অবস্ট্রাকশন হয় না। মাইক্রোস্কোপ এ দেখা যায় ক্রিপ্ট এর গঠন পরিবর্তন, প্লাসমা কোষ, লিমফয়েড কোষ এর আধিক্য।

অন্য দিকে **ক্রোন্স ডিজিজ (Crohn's Disease)** এ ৩০ থেকে ৪০ ভাগ ক্ষুদ্রান্ত্রে, ৪০ থেকে ৫০ ভাগ বৃহদান্ত্রে, ১৫ থেকে ২০ ভাগ শুধু কোলাইটিস হয়। এই অসুখ মাংসের মধ্যে গভীরে বিস্তৃত হয়। **আপথস আলসার** থেকে শুরু করে **স্টিলেট আলসার** অবধি হয়। এন্ডসকপি তে কব্বলস্টোন এর মত দেখতে হয়। মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় **ক্রিপ্ট অ্যাবসেস, নন কেজিয়েটিং গ্রানুলমা**।

টক্সিক মেগাকোলন আলসেরেটিভ কোলাইটিস (Ulcerative Colitis) এর এক কঠিন সমস্যা।

ক্রোন্স ডিজিজ এ অন্ত্রের সঙ্গে ভিতরের অন্য অঙ্গের যোগাযোগ বা বাইরে পুঁজের মত বের হওয়া (**ফিসচুলা**) এক জটিল সমস্যা। ক্রোন্স এ স্ট্রিকচার হয় অন্ত্রে যা **ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন** করে।

আলসেরেটিভ কোলাইটিস এর প্রধান প্রধান লক্ষণ গুলি হল—পাতলা পায়খানা, রক্ত মিশ্রিত পায়খানা, মিউকাস যুক্ত পায়খানা, পেটে ব্যথা, পায়খানা বসার অসম্পূর্ণতা বোধ, যেগুলি অনেক দিন ধরে চলছে এবং সাধারণ চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে না।

আবার ক্রোন্স ডিজিজ এ পাতলা পায়খানা, পেটে ব্যথা, জ্বর, খাদ্যনালী আটকে যাওয়া, গুটলি বেঁধে যাওয়া, পেট ফুলে যাওয়া, বমি করা, মল দ্বারের পাশে পুঁজ বের হওয়া, খাদ্যরস শোষণ না হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। দুই ক্ষেত্রেই ওজন কমে যেতে পারে।

রোগ দুটি অন্ত্রের, কিন্তু অন্ত্রের বাইরেও অনেক লক্ষণ দেখা যায়। কখনও অন্ত্রের বাইরের এই লক্ষণ গুলি মূল রোগ ধরা পড়ার আগেই দেখা যায়। অন্ত্রের বাইরের সংশ্লিষ্ট রোগ গুলি হল—**এরিথেমা নোডসম, পায়োডারমা গ্যাংরেনসম, স্যাক্রোআইলিটিস, প্রাইমারি স্কেলেরোসিং কোলানজাইটিস**। এগুলি আলসেরেটিভ কোলাইটিসএ বেশি হয়। আবার **গাঁটের ব্যথা, অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডেলাইটিস, পিত্ত থলি ও কিডনির পাথর,** ক্রোন্স ডিজিজ এ বেশি দেখা যায়। আই বি ডি র মত লক্ষণ বহু অসুখে দেখা যায় এবং সেগুলি কে অন্যান্য লক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তফাৎ করতে হয়। আই বি ডি সমতুল্য রোগগুলি হতে পারে—অন্ত্রের কোন ইনফেকশন (টিবি, সালমোনিলা, সিগেল্লা, ই কোলাই, অ্যামিবা, হুক ওয়ারম, কোন ভাইরাস বা ফাঙ্গাস), ক্যান্সার, ওষুধ জনিত পার্শ্বক্রিয়া, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, ডাইভার্টিকুলাইটিস।

কি কি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে? প্রথমে সাধারণ পরীক্ষা গুলি করতে হয়। যেমন কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, সি আর পি, লিভার ফাংশন টেস্ট, রেনাল ফাংশন টেস্ট; রক্তে আয়রন, ভিটামিনস,

ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এর মাত্রা ইত্যাদি। সেরলোজি টেস্ট এর মধ্যে **আসকা** (অ্যান্টি সাক্কারোমাইসিস অ্যান্টিবডি), পি আনকা (পেরিনিউক্লিয়ার অ্যান্টিনিউট্রোফিল সাইটোপ্লাস্মিক অ্যান্টিবডি) ইত্যাদি। মল এ দেখা হয় ক্যালপ্রটেক্টিন, ল্যাক্টোফেরিন। বেরিয়াম মিল ফলো থ্রু একস রে, সিটি বা এম আর আই এন্টারগ্রাফি অসুখ টির সম্যক ধারণা দেয়। **কোলনোসকপি** করে চাক্ষুস দেখা এবং রুগ্ন জায়গা থেকে বায়োপসি নিয়ে পরীক্ষা করা রোগ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষ ক্ষেত্রে ক্যাপসুল এন্ডসকপি র সাহায্য নেওয়া হয়। আলসেরেটিভ কোলাইটিস এর তীব্রতা নির্ণয়ের জন্য মন্ট্রিয়েল ক্লাসিফিকেশন আর ক্রোন্স ডিজিজ এর জন্য ভিয়েনা ও মন্ট্রিয়েল ক্লাসিফিকেশন ব্যবহার করা হয়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রথমে রোগীর পুষ্টির দিকে নজর দেওয়া হয়, সঙ্গে রোগের নির্দিষ্ট ওষুধ দেওয়া। রোগী কে স্যালাইনের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেলস ইত্যাদি দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট ওষুধের মধ্যে **৫ এ এস এ** জাতীয় ওষুধ **(সালফাসালাজিন, মেসালামিন, ওলসালাজিন, বলসালাজাইড)**, স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ **(হাইড্রোকর্টিজন, মিথাইল প্রেডনিসলন**-মুখে, ইনজেকশন বা এনেমা র মাধ্যমে), স্টেরয়েড স্পেয়ারিং এজেন্টস **(অ্যাজাথাইওপ্রিন, ৬ মার্কাপ্টপুরিন, মেথট্রেক্সেট, সাইক্লোস্পরিন, টাকরলিমাশ)**, বায়োলজিক থেরাপি (**ইনফ্লিক্সিমাব, আডালিমুমাব** ইত্যাদি), স্মল মোলিউকুল (**টফাসিটিনিব**)।

বিশেষ ক্ষেত্রে অপারেশন লাগে—**প্রক্টো কোলেকটমি, স্ট্রিকচারোপ্লাস্টি, ইন্টেস্টিনাল রিসেকশন আনাসটোমোসিস** ইত্যাদি।

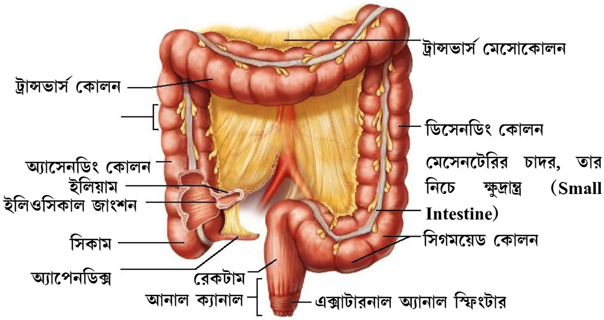

বৃহদন্ত্র (Large Intestine)

---

* ডাঃ অরিজিৎ সিনহা, বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Few words on Universal Health Coverage (UHC)

Barun Kanjilal*

[Excerpt from an interview of Prof. Barun Kanjilal, Eminent Professor of Health Economics. Compilation: Dr. Manoj Ghosh]

Q: What is UHC? Your perspective. Why is it essential?

BK: WHO definition of Health is Universal. **UHC** is to ensure that all people no matter who they are, where they live, they get equality of health service, whenever they need it without any incoming financial hardship. So basically it is an idealistic goal that everybody wants to achieve. All of us, anybody who needs healthcare, receives healthcare according to the need, probably with a payment but that won't cause financial stress. So it is a beautiful world if we achieve that. WHO started with a famous cube, **3 dimensions: % of people covered, % of service covered, % of financial risk protection**. Maximum number of people will be covered, max number of diseases or health issues will be covered, nobody will suffer from any substantial financial problem for that. This is the cube. It is like a room. Room is like a cube. Now your healthcare system is like a small suitcase in this room. This suitcase is also a cube, and we are expecting this small cube to increase in length, width and height. And ultimately it will touch the dimensions of the room. And when it reaches the room, that is our ultimate goal. Practically it'll never touch. It'll never reach that stage because not only the suitcase is expanding, so does the room. More people are coming, more needs are there, so more people are needed to be saved from financial stress. So, it's a dynamic

process. The small box is expanding to become equivalent to the room but it'll never happen.

Why it is Essential? Well, one might think and link it to health just because the word health is there. But it is essential not only for health. But actually in a wider context, if you look at the two main problems: inequity and poverty. UHC is a step in a wider context. To fight against poverty and inequity. And if you look at the **Sustainable Development Goals (SDG)** (2015), there are 17 goals. One of the goals: SDG 3 is basically for Good Health and Wellbeing. One can argue that attainment and maintenance of UHC is key to achieve all of the 17 goals. It is basically valid and a need. For that it requires a fundamental shift, how we think and how we define, and how we provide healthcare. Just you have to shift, you know, from that very disease specific, very much target oriented approach, number centric approach to more comprehensive people oriented approach.

Q: True sir, The way you are explaining ………people especially who are new to public health…We need to reach the underserved population… villages, rural areas, tribal areas. There are areas where people have not seen healthcare centers.

Some countries like Thailand have achieved UHC, I have read. So as per you, your perspective of what kind of financial model that Thailand is having India is not having, how we can go for that?

BK: Well, you know, as I have said UHC is not a financial model but a new paradigm as I have said.

Q: Yes sir.

BK: It is not only about **financing**, but also **planning, delivery, provisioning** everything in a model. So it's in a sense, be it Thailand, be India, or any other country model, the end

point is of course the UHC type situation. The difference between these countries or models is what you are following to achieve UHC goals. Universally there are 4 types of models to achieve UHC. UHC is not a model. One model is like in the USA, **entrepreneurship** where the market is the key player. Second model is the NHS** model like in the UK, Spain, Sri Lanka and most of the countries: where services are tax financed. **Mandatory insurance models** are also there like Germany, France etc. mainly social insurance follows. For them insurance is mandatory. And then like our country's **mixed model**, neither here, nor there. The uniqueness of UHC is that: it is the first time that financial hardship is being officially acknowledged since the **Alma-Ata Declaration, Health for All**. It never said to achieve Health for All what finance model or challenge you will face. But UHC is basically focusing on that. At the same it is also not telling you like, see it is a never ending process. You cannot reach an endpoint here, because there's none. It is not a one time thing. It's not like you have done, and that set. It is not so. And finance will flow for primary and comprehensive care, most of the time.

Going back to your question. It was 2002-2003. They started giving promises. They understood health is an issue. So, they announced that everybody will get health care. This is called the thirty baht scheme. Baht, currency, per head 30 baht, and you will get cure/treatment of all diseases, kind of a thing. Initially, it was thought it would come via insurance. But when they announced it for political reasons, they realized that within such a short span of time we wouldn't be able to organize that. So then they ultimately chose the Govt finance route. The Govt. will fund everything.

---

* Prof. Barun Kanjilal, Former Faculty, Health Economics, IIHMR (Jaipur) & IPH (Kalyani) ** National Health Service

Excerpt of a study on Epidemiology of Diarrhoea among Under Five Children in a village in Sundarbans by Prof. D.N. Guha Mazumder and his team, 2013–'14

Diarrhoea continues to be an important cause of morbidity and mortality and an important cause of malnutrition among young children in developing countries including India. **Childhood mortality rates** in general and **infant mortality** in particular, are often used as broad indicators of social development or as specific indicators of health status. On average, children below 3 years of age in developing countries, including India, experience about three episodes of diarrhoea each year. Diarrhoea continues to be an important contributor to childhood deaths in India. Diarrhoea is among the top 10 causes of death among infants and children 0–4 years of age. About 10 per cent of infants and 14 per cent of 0–4 years children die due to diarrhoea in India.

Poor sanitation, lack of access to clean water supply and **inadequate personal hygiene** are responsible for 90% of diarrhoeal disease occurrence, these can be easily improved by health promotion and education. Some of the important measures for diarrhoea control are fluid replacement to prevent dehydration, measles vaccination, promotion of early and exclusive breastfeeding, promotion of hand washing with soap, improved water supply quantity and quality, including treatment and safe storage of household water, and community-wide sanitation promotion.

The Indian Sundarbans comprises 19 community development blocks – 13 under South 24 Parganas and 6 under North 24 Parganas districts of West Bengal with a total population

of 4.1 million. Out of these, the **Basanti block** selected in this study, is one of the main deltaic islands in the Sundarbans bounded by the Matala and Vidyadhari rivers/creeks. 44% of population belongs to SC and ST, 85% are living on agriculture, of which 90% are landless agricultural laborers and marginal farmers. Other occupations are fishing, pisciculture, wood cutting and honey collection. The level of literacy and per capita income is much below the state average and most of the people fall below the poverty line. The communication and transport network is very poor and most of the areas are inaccessible. Provision of health care is extremely poor. Frequent climatic insult is a regular feature – cyclonic storm, inrush of tidal waves and flooding – is the cause of recurrent damage of lives, crops and property every year.

The study village, **Hogolduri** under **Ramchandrakhali G.P**, was selected because of its large population size, socioeconomic backwardness and being severely affected by **Aila Cyclone** during 2007.

A cross sectional study was undertaken in the population residing all households in the above village in 2013 – 2014. A total number of 5265 participants residing in 1231 households were studied. Pretested questionnaire, was prepared for collection of information and data collection during house to house visit of all households in the study village. The questionnaires incorporated information regarding demographic and socio economic characteristics, availability and usage pattern of safe drinking water for drinking purpose, hygienic habits and sanitation practice by the family members, the literacy, occupation status, habit of exclusive breast feeding and use of ORS by mothers, and of children's nutrition and vaccination status. Nutrition of children was assessed by determining under nutrition as <2SD (Standard Deviation) in the Z-score which was determined

according the standard WHO table on body weight in relation to specific age and sex. Frequency of occurrence of diarrhoea during last three months and during last one year in each child under five years of age were recorded from every family. In the context of safe drinking water, drinking water sources of each household was recorded. For sanitation, questions regarding whether the households possess latrine or practice open defecation was recorded. Hygienic habits like washing hands with soap after defecation, before taking meals and after handling of children's stool were noted. Height and weight of each child were measured to understand the nutritional status of children. Whether ORS was being administered by mothers during diarrhoea was also noted. 533 children aged under five years, were found in 1231 households born of 526 mothers. All data regarding incidences of diarrhoea in these children and socio economic and mother related parameters were collected.

Out of 5265 people residing in 1231 households, 52.2% were males. Majority of the people were Muslims (79%). 47% of head of families were either illiterate or just literate. 27.5% were laborers or farmers. Majority (80.7%) of the families belonged to **below poverty line (BPL)**. There were 533 children aged less than 5 years, born out of 526 mothers. Out of the children studied 21% were aged below 1 year. Body weight was < 2SD compared to standard body weight in relation to age and sex in 41.28% of children. Full immunization with Polio, DPT, Measles and Hepatitis B vaccines was 34.52% of children. Exclusive breast feeding for six months was found to be given in 58.35% of children. 24.90% and 18.44% of mothers were illiterate and just literate respectively. 71.4% mothers were home makers. 72.6% mothers were found to have knowledge of use of ORS for the treatment of diarrhoea. Hand washing with soap and water

after cleaning children's stool was practiced by 27.5% and 69.2% used soil. Washing hands with soap and water after defecation was practiced by 33% of families but only 1.79 % of families used soap for cleaning hands before taking food. 65% population used soil for cleaning hands after defecation. 36.2% of households had sanitary latrines, others were practicing open defecation. Residents were getting safe drinking water from 92 tube wells in the area. Diarrhoea occurred during last three months in 45% of children, among them 43.8% were boys and 46.7% were girls. Diarrhoea occurred during last 1 year in 67.9% of children. Incidences of diarrhea was highest in the age group of 12 - 24 month (60.4%) in the last 3 months and 83.17% in last 1 year.

The prevalence of diarrhoeal disease was found to be very high in children below 5 years of age. Important contributing factors for such morbidity of children were found to be - absence of latrines in households, non use of soaps for hand washing after defecation and after child's stool cleaning, absence of **vaccination against measles and low nutritional status of children**.

Courtesy: (1) Srimati Shyamasree Mukherjee; (2) DNGM Research Foundation

* Prof. D. N. Guha Mazumder was the HOD, Gastro-enterology & Medicine,. IPGMER, Kolkata and WHO Consultant on Arsenicosis. Pix: Dr. N. Pati

জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচি

বয়স	টিকার নাম
জন্মলগ্ন	(১) বিসিজি, (২) ওপিভি*, হেপাটাইটিস বি টিকা
৬ সপ্তাহ	(১) ওপিভি, (২) পেন্টাভ্যালেন্ট$_{১}$ (ডিপিটি+হিপ বি**+হেপ বি), (৩) রোটা ভাইরাস টিকা, (৪) আইপিভি$_{১}$ এর ফ্র্যাকশনাল ডোজ, (৫) নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন (PCV)
১০ সপ্তাহ	(১) ওপিভি$_{২}$, (২) পেন্টাভ্যালেন্ট$_{২}$, (৩) রোটা ভাইরাস টিকা$_{২}$ (RVV)
১৪ সপ্তাহ	(১) ওপিভি$_{৩}$, (২) পেন্টাভালেন্ট$_{৩}$, (৩) আরভিভি$_{৩}$ ও পিসিভি$_{২}$
৯-১২ মাস	(১) এমআর$_{১}$ (মিসলস ও রুবেলা), (২) জেই$_{১}$ (জাপানি এনকেফেলাইটিস), (৩) পিসিভি বুস্টার
১৬-২৪ মাস	(১) এমআর$_{২}$, (২) জেই$_{২}$, (৩) ডিপিটি (ডিপথিরিয়া, পারটুসিস, টিটানাস) বুস্টার$_{১}$, (৪) ওপিভি - বুস্টার
৫-৬ বছর	(১) ডিপিটি - বুস্টার$_{২}$
১০ বছর	(১) টিটি (টিটানাস টক্সয়েড), (২) টিডি (অ্যাডাল্ট ডিপথিরিয়া)
১৫ বছর	(১) টিটি, (২) টিডি
গর্ভবতী মা	টিটি ও টিডি ১, ২, ও বুস্টার

* ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন ** হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন

আর্সেনিকোসিস (Arsenicosis)

* ছয় মাস বা তার বেশি সময় ধরে খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক মাত্রার বেশি (০.০১ মিগ্রা/লিটার, WHO) আর্সেনিক দেহে প্রবেশ করলে আর্সেনিকোসিস রোগ হয়
* রক্তাল্পতা, জন্ডিস, অপুষ্টি, পা ফোলা, আঙ্গুলের নখ বেঁকে যাওয়া, দুর্বলতা, চোখ লাল, নাক ও মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, ডায়রিয়া, ডায়বেটিস ইত্যাদি হলেও এর মূল লক্ষণ চামড়ায়
* চামড়ায় হাইপারকেরাটোসিস, হাইপার অথবা হাইপো পিগমেন্টেশন, মেলানোসিস, এক্সফোলিয়েটিভ ডারমাটাইটিস, ভিটিলিগো, স্কোয়ামাস ও বেসাল সেল ক্যানসার ইত্যাদি হয়। দেহের অন্যান্য তন্ত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়
* কৃষি ও অন্যান্য কাজে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ভূস্তরের জল তুলে নেওয়ায় এর প্রকোপ বৃদ্ধি। পশ্চিমবঙ্গের নয়টি জেলা আক্রান্ত
* সঙ্গে দোসর ফ্লুরোসিস (**Fluorosis**)

পরিশিষ্ট

ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র সাহা (১৯৩০-২০১৬) ছিলেন গরীবের চিকিৎসক। গরীব রোগের চিকিৎসক। কলকাতার 'স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন'-র ব্রিটিশ আমলে নির্মিত আউটডোরের পুরনো বড় বড় ঘর, অযত্নে মলিন, আলোর অভাব, তার চাইতেও বড় সমস্যা রোগীদের উপছে পড়া ভিড়। সেখানে ৭০ ও ৮০-র দশক জুড়ে অত্যন্ত ধৈর্য ও যত্ন সহকারে যে নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক প্রতিদিন গা-গঞ্জ শহুরে বস্তির অসংখ্য জটিল, না সারতে চাওয়া রোগীদের দেখে গেছেন এবং আন্তরিকভাবে চিকিৎসা চালিয়েছেন, তিনি হলেন অধ্যাপক ক্ষিতিশ চন্দ্র সাহা (প্রফেসর কে. সি. সাহা নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন) । যখন চর্ম বা ডার্মাটলজি বিষয়টি তেমন কৌলিন্য পায়নি তখন তিনি বিষয়টি নিয়ে গবেষণা ও অনুশীলন চালিয়ে গেছেন, হাতে ধরে শিখিয়েছেন অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে। আউটডোরে রোগীদের মধ্যে চব্বিশ পরগনার হাবড়া-অশোকনগর অঞ্চল থেকে আসা রোগীদের মধ্যে চামড়ায় কেরাটোসিসের আধিক্য দেখে তিনি গভীর অনুসন্ধান চালালেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের জিওলজি বিভাগের সাহায্যে রোগীদের নখ ও চুলের নমুনায় আর্সেনিক ডিপোজিট পেলেন। অন্যদিকে 'এ.আই.আই.এইচ. অ্যাণ্ড পি.এইচ.'-র সাহায্যে উক্ত অঞ্চলে ঘরে ঘরে গিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে ও পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষা করে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পেলেন। এরপর তাঁর বিখ্যাত রিপোর্ট প্রকাশিত হল ১৯৮৪ সালে যার থেকে সারা বিশ্ব জানল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় দুই বাংলা জুড়ে **ক্রনিক আর্সেনিকোসিসের** প্রাদুর্ভাব।

অবিভক্ত বাংলার ঢাকার মীরপুরে জন্ম। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এম.বি.বি.এস-এ মেডিসিন ও প্যাথোলজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পান। ট্রপিকাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা এবং জেনারেল মেডিসিনে এম.ডি. করেন। ১৯৫৭ তে ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে যোগ দেন। ৩০ বছর কৃতিত্বের সাথে কাজ করে ১৯৮৭-তে অবসর নেন। অধ্যাপক সাহার আর্সেনিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, তার গোত্র ভাগ (চার স্তর, সাত গোত্র, ২০ উপগোত্র) প্রভৃতি যেমন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানমণ্ডলী গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই **ডারমাটোগ্লাইফিকস্**

নিয়ে তাঁর পথিকৃৎ গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। দেশে বিদেশে ১০০-র বেশী গবেষণাপত্র, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে অংশগ্রহণ এবং ডার্মাটলজি নিয়ে বহু পুস্তক প্রকাশনা তাঁকে যশস্বী করেছে। এর বাইরেও তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট গায়ক, সুরকার, সঙ্গীত রচয়িতা, নাট্যকার, অভিনেতা ও লেখক। দূরদর্শনে নিয়মিত গানের অনুষ্ঠান করতেন। তাঁর বেশ কিছু গানের সিডি, ভিডিও, ক্যাসেট বেরিয়েছিল।

আর্সেনিক বিষক্রিয়াকে তিনি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সরকার ও জনসাধারণকে সচেতন করতে পথে নেমেছিলেন। পথনাটিকা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রচার আন্দোলন, পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এবং রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ছুটে ছুটে যেতেন অসুস্থ দরিদ্র রোগীদের কুঁড়ে ঘরে, যথাসাধ্য তাদের সহযোগিতা করতেন। আমৃত্যু তিনি অমায়িক ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে জনহিতে কাজ করে গেছেন।

ডাঃ দিলীপ মহলানবিশ (১৯৩৪-২০২২)

প্রচারের অগোচরে থেকে নীরবে গবেষণা ও তার প্রয়োগ করে মানবজাতির মঙ্গল সাধনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত চিকিৎসক বিজ্ঞানী ডাঃ দিলীপ মহলানবিশ। ১৯৭১-র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের মধ্যে যখন কলেরা মহামারির প্রাদুর্ভাব, যখন আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসায় প্রচলিত ইনট্রাভেনাস ফ্লুইড অপ্রতুল, সেই সময় বিশ্বখ্যাত জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতার 'নাইসেডে'র এই চিকিৎসক-গবেষক নুন, চিনি, খাবার সোডা ও জল পরিমাণগত মিশিয়ে **'ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন (ও.আর.এস.)'** প্রস্তুত করে রোগীদের খাইয়ে তাদের মৃত্যুহার একেবারে কমিয়ে দিলেন। ১৯৫৩-এ 'ল্যানসেট' এবং ১৯৫৯-এ 'নেচার' পত্রিকায় দুই বাঙালি চিকিৎসক **হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়** ও **শম্ভুনাথ দে** কলেরা ও আন্ত্রিক রোগের ক্ষেত্রে 'ও.আর.এস.-র যে ভূমিকার কথা বলেছিলেন তার প্রায়োগিক সাফল্য দেখালেন দিলীপ মহলানবিশ। আর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার সারা পৃথিবী জুড়ে ডায়ারিয়াতে মৃত্যুর হার একেবারে

কমিয়ে দিল। যদিও তার স্বীকৃতি পেতে আরও সাতটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে জন্ম। দেশভাগে ছিন্নমূল পরিবার হয়ে কলকাতার বরানগরে পরে হুগলির শ্রীরামপুরে চলে আসা। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি ১৯৫৮ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে শিশুরোগ বিভাগের হাউসস্টাফ হন। ১৯৬০-এ ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে (এন.এইচ.এস.) যোগ দেন। লন্ডনে পেডিয়াট্রিকসে ডি.সি.এইচ. করেন। এডিনবরা থেকে এম.আর.সি.পি. করেন। এরপর মাত্র ২৮ বছর বয়সে প্রথম ভারতীয় হিসাবে লন্ডনের কুইন এলিজাবেথ হসপিটাল ফর চিল্ড্রেনের রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হন। পরে 'মেডিকেল কেয়ার ফেলো' হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। তারই গবেষণার কাজে ১৯৭০-এ ভারতে প্রত্যাবর্তন। এরপরেই কলকাতার **'নাইসেড' (আই.সি.এম.আর.)**-র তরফ থেকে পূর্ব পাকিস্থান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের উপর ওআরএস নিয়ে সফল পরীক্ষা।

পরে তিনি দীর্ঘদিন **বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউ.এইচ.ও.) ডায়রিয়া ডিজিস কন্ট্রোল প্রোগ্রামের** মেডিকেল অফিসার ও কনসালস্ট্যান্ট এর দায়িত্ব সামলেছেন। যার মধ্যে আফগানিস্তান, মিশর ও ইয়েমেনে তাঁর কাজ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কলকাতার **'ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথে'র (আই. সি.এইচ.)** সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের **'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়ারিয়াল ডিজিস রিসার্চ'** এর ক্লিনিকাল সায়েন্সের অধিকর্তা ছিলেন। **'সোসাইটি ফর অ্যাপ্লায়েড স্টাডিজ'** সংস্থা গড়ে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর সঞ্চিত অর্থ থেকে আই.সি.এইচ.-কে এক কোটি টাকা দান করেন। বিদেশে প্রচুর সম্মাননা পান যার মধ্যে পলিন প্রাইজ ও প্রিন্স মাহিদাল এওয়ার্ড উল্লেখযোগ্য। ২০২৩এ ভারত সরকার তাঁকে মরণোত্তর **পদ্মবিভূষণ** সম্মাননা দেয়। তাঁর স্ত্রী জয়ন্তী মহলানবিশ ছিলেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা।

পেটের রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র : গ্যাসট্রোএন্টারলজি ডিপার্টমেন্ট—(১) আই পি জি এম ই আর, কলকাতা; (২) কলকাতা মেডিকেল কলেজ; (৩) আর জি কর মেডিকেল কলেজ; (৪) নীল রতন সরকার মেডিকেল কলেজ; (৫) কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ; (৬) এ আই আই এম এস, কল্যাণী; (৭) আই আই এল ডি এস, সোনারপুর; (৮) এ আই জি, হায়দ্রাবাদ; (৯) আই আই এল বি এস, নিউদিল্লি; প্রমুখ।

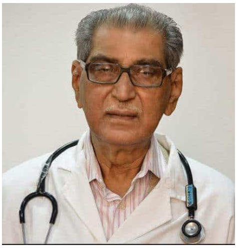

ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ গুহ মজুমদার (১৯৩৪-২০২৫)

পেটের রোগের নতুন ধারার চিকিৎসার পথিকৃৎ, দেশের অগ্রগণ্য গ্যাসট্রোএন্টারলজিস্ট এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক গবেষক অধ্যাপক গুহ মজুমদারের জন্ম অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায়। বেড়ে ওঠা ও প্রাথমিক শিক্ষা চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন সংলগ্ন প্রান্তিক ব্লক গোসাবায়। তাই বোধহয় অবহেলিত সুন্দরবনের দরিদ্র মানুষদের জন্য আমৃত্যু কাজ করে গেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ডি এন জি এম রিসার্চ ফাউণ্ডেশন'এর মাধ্যমে। ১৯৫৬এ আর.জি. কর মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে ১৯৫৯এ 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিস'এ যোগ দেন। ১৯৬১তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিসিনে এম.ডি. করেন। ১৯৭৪ থেকে এন. আর. এস., বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ, আই.পি.জি.এম.ই.আর., কলকাতায় তিনি চিকিৎসক অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন পেটের রোগ, কৃমি সংক্রমণ, সিরোসিস, কলেরা, আর্সেনিকোসিস প্রভৃতি বিষয়ে নিরলস গবেষণা শুরু করেন। মূলত তাঁর প্রচেষ্টায় **আই.পি.জি.এম.ই.আর**-এ এই বিষয়গুলির উপর গবেষণা এবং **গ্যাস্ট্রো এন্টারলজি** শাখার বিস্তার হয়। তিনি ১৯৮৮-'৮৯ আই.পি.জি.এম.ই.আর.-এর মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান এবং ১৯৮৯-২০০০ গ্যাসট্রোএন্টারলজির বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। অবসরের পরও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বি সি রায় ইনস্টিটিউট অফ বেসিক মেডিসিন, অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ, আই সি এম আর, ডব্লিউ এইচ ও প্রমুখ বহু নামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সহ বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কাজে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর রয়েছে প্রচুর গবেষণাপত্র।

ডাঃ সুজিত কুমার ভট্টাচার্য

পেটের রোগ এবং ক্রান্তীয় সংক্রামক ব্যাধির বিষয়ে দেশের একজন অগ্রগণ্য চিকিৎসক গবেষক। এন.আর. এস. মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ডি.। তিনি **'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যাণ্ড**

এন্টেরিক ডিজিজেস (নাইসেড)', বর্তমানে 'এন.আই.আর.বি.আই.' কলকাতা এবং **'রাজেন্দ্র মেমোরিয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স (আর.এম.আর.আই.এম.এস.), পাটনার** ভূতপূর্ব ডিরেক্টর ছিলেন। এডিশনাল ডিরেক্টর ছিলেন ভারত সরকারের **'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আই.সি.এম.আর.),** নিউ দিল্লি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। আন্ত্রিক রোগ ও কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের জাতীয় গবেষণা ও কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর ৫০০-র উপর গবেষণাপত্র রয়েছে।

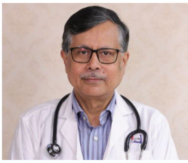

ডাঃ অশোকানন্দ কোনার

কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক ও এম.ডি. করে যুক্তরাজ্য থেকে এম.আর.সি.পি. এবং এফ.আর.সি.পি. করেন। তারপর দেশে ফিরে আই.পি.জি.এম.ই.আর., কলকাতায় যোগ দেন এবং সেখানে চিকিৎসা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। রাজ্যের অগ্রগণ্য গ্যাসট্রোএন্টারলজিস্ট। বর্তমানে কলকাতার পিয়ারলেস হসপিটাল ও ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যাণ্ড ডাইজেসটিভ সায়েন্স এর সঙ্গে যুক্ত।

সংকলন: ডাঃ সমীরণ পাণ্ডা ও অরণি সেন

পেটের রোগের উপসর্গ ও লক্ষণ : রক্তাল্পতা, জন্ডিস, মুখে ঘা (Angular Stomatitis), জিভে ঘা (Glossitis), প্যারোটিড গ্রন্থির বৃদ্ধি, দাঁতের ক্ষয়, লসিকা গ্রন্থির বৃদ্ধি, হাতের নখ বেঁকে যাওয়া, চামচাকৃতি নখ (Koilonychia), চামড়ায় লালচে চাকতি (Erythema nodosum), বেদনাদায়ক চামড়ায় ঘা (Pyoderma gangrenosum), কৃশতা, ওজন কমে যাওয়া, জলশূন্যতা, পেট ফুলে যাওয়া, পেটে জল জমা, পেট ব্যথা, রক্ত বমি, মলের সঙ্গে রক্ত (অর্শ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাজা ও পেপটিক আলসার ও ভ্যারিক্স ফেটে কালো রক্ত), অন্ত্রের নড়াচড়ার (Peristalsis) শব্দ থেমে যাওয়া, কমে যাওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া অথবা অস্বাভাবিক শব্দ (Abnormal Bowel Sounds or Bruits) প্রভৃতি।

জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-৫ (নব পর্যায়) :
পেটের রোগ এবং তাদের চিকিৎসা

- পানীয় জল ফুটিয়ে খান, শিশুদের টিকা দিন
- খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশন করার আগে, খাবার আগে, শিশু-বৃদ্ধ-রোগীদের পরিচর্যার আগে ও শৌচক্রিয়ার পর ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন
- খাবার বেশিক্ষণ বাইরে বা ফেলে রাখবেন না; একান্ত রাখতে হলে ঢাকা দিয়ে উপযুক্ত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন
- পরিমিত, পুষ্টিকর, সুষম আহার ও পর্যাপ্ত পানীয় জল গ্রহণ করুন; টাটকা ফল, শাকসব্জি, দুধ, ডিম, মাছ-মাংস খান; ফল, শাক সব্জি, মাছ-মাংস, ডিম খাবার বা রান্না করার আগে ভালো করে ধুয়ে এবং দুধ ফুটিয়ে নিন; অল্প তেল, মশলা, নুন দিয়ে গৃহে প্রস্তুত খাদ্যগ্রহণ করুন
- নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন এবং গৃহের চারপাশটা পরিচ্ছন্ন রাখুন; মাছি, আরশোলা, ইঁদুর, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করুন; প্রতিদিন মলত্যাগ ও স্নান করুন এবং নিয়মিত উপযোগী ব্যায়াম ও খেলাধূলা করুন; খালি পেটে থাকবেন না, বেশি খাবেন না এবং নির্দিষ্ট সময়ে অন্তত চার ঘণ্টা করে ব্যবধান রেখে দিনে চারবার আহার করুন
- ধূমপান, তামাক, গুটকা, মদ, ড্রাগস সহ কোনপ্রকার নেশা থেকে বিরত থাকুন; চা-কফি খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করুন; ঠাণ্ডা পানীয়, ফাস্ট ফুডস, জাঙ্ক ফুডস, প্যাকেটে সংরক্ষিত খাদ্য, খোলা রাখা খাবার, বাসি-পচা খাবার, কাঁচা-ভাজা-পোড়া-মশলাদার খাবার, বারোয়ারি ভোজ ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের পক্ষ থেকে অরণি সেন কর্তৃক প্রকাশিত

যোগাযোগ: ssunnayan@gmail.com • ওয়েবসাইট: www.ssu2011.com

বিনিময় : ৮০ টাকা